নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ১

মার্চ ১৯৯৫

অনুবাদ ও সারসংক্ষেপ
মসউদুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
সালেহউদ্দীন আহমেদ,
মু. গোলাম সাত্তার
সিরাজ হোসেন খান
হাসান শরীফ আহমেদ

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

গ্রন্থস্বত্ব	:	ব্র্যাক
প্রকাশকাল	:	মার্চ ১৯৯৫
প্রকাশক	:	গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা ১২১২
প্রচ্ছদ	:	নাজমা দে
মুদ্রণ	:	ব্র্যাক প্রিন্টার্স ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা ১২১২

Nirjash: Summary of selected RED research reports of 1991. Number 1, March 1995. Published by the Research and Evaluation Division, BRAC, 66 Mohakhali C/A, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সাইক্লোনোত্তর পরিস্থিতি: একটি সমীক্ষা	১
বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের দৈনন্দিন জীবন	১৭
দরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের গৃহায়ণ কর্মসচি: একটি সমীক্ষা	২৮
গ্রাম সংগঠনগুলোকে নিয়ে ফেডারেশন গঠন: কিছু অভিমত	৩৫
ব্র্যাকের প্যারালিগ্যাল কর্মসচি: একটি সমীক্ষা	৪১
আরডিপিভুক্ত গ্রাম সংগঠনের বিষয়ভিত্তিক সভা	৪৬
পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: একটি কোর্সের মল্যায়ন	৫২
মাসিক রক্তস্রাব: কিশোরী মেয়েদের বিশ্বাস ও আচরণ	৫৯
ভূমিহীনদের মালিকানায় সেচ ব্যবস্থা ও সমাজে তার প্রভাব	৬৭
পলী এলাকায় সাক্ষরতা: এনএফপিইভুক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র	৭৩
ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি স্কুলে কেমন করছে	৮০
প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: গ্রামের একটি স্কুল সমীক্ষার ফলাফল	৮৫
পলীর দরিদ্র মানুষের জীবনে মৎস্যচাষের প্রভাব	৯১
পলীর দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া	৯৬
পর্বেকার যৌথ ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণ	১০০
বাংলাদেশে পলী রেশনিং ব্যবস্থা: একটি মল্যায়ন	১০৪

আইজিভিজিডি কর্মসচির প্রভাব: একটি উপজেলায় পোল্ট্রি কর্মীদের কার্যক্রমের সমীক্ষা ১১১

স্বাস্থ্য বিষয়ক

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা: শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ ১১৮
স্বাস্থ্যসেবিকাদের কাজের একটি মল্যায়ন ১২৪
মহিলাদের গর্ভধারণ এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহার ১৩০
স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে মাদার্স ক্লাবের প্রভাব ১৩৩
বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রচলিত নাম ১৩৬
পলী এলাকায় চাল-লবণের তৈরী খাবার স্যালাইনের ব্যবহার ১৪১

সম্পাদকীয়

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বৃদ্ধি, ঋণদান এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আজ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে যা দেশে বিদেশে বেশ সমাদৃত। ব্র্যাকের এই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিকে প্রয়োজনীয় গবেষণা সহায়তা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ১৯৭৫ সাল থেকে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। কোন কর্মসূচির শুরু থেকে এর বিকাশের প্রতিটি পর্যায়েই গবেষণার প্রয়োজন।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ব্র্যাকের নিজস্ব কর্মসূচির উপর গবেষণা ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার অনেকগুলোই দেশে বিদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল ব্র্যাকের সকল কর্মী বিশেষ করে মাঠকর্মীদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে নিয়মিত 'নির্যাস' প্রকাশিত হয়ে আসছে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ পর্যন্ত আটশতেরও অধিক গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যার প্রায় সবগুলোই ইংরেজী ভাষায় রচিত। ব্র্যাকের সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীগন যাতে গবেষণার ফলাফল থেকে উপকৃত হতে পারেন সেজন্য ইংরেজী রিপোর্টগুলোর সার-সংক্ষেপ সহজ বাংলায় নির্যাস-এ স্থান পায়। গবেষণার ফলাফলের ব্যাপক সঞ্চারনের এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষনার ফলাফল আরো অধিক সংখ্যক পাঠক জানতে এবং প্রয়োগ করতে পারবেন বলে আমরা আশা করি। নির্যাস প্রকাশের শুরু থেকেই মাঠকর্মীদের নিকট নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। যা থেকে ব্র্যাকের প্রত্যেক কর্মসূচির কর্মীরা সকল কর্মসূচি সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়।

শিক্ষা ও উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কথা চিন্তা করেই ব্র্যাক ১৯৭৫ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। কিশোর-কিশোরীদের জীবনে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব এবং এ শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা

জানা যাবে বর্তমান সংখ্যার একটি গবেষণা রিপোর্ট থেকে। ব্র্যাক স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করে শিক্ষার্থীরা কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করে এবং তা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তাও জানা যাবে এ সংখ্যা থেকে। তাছাড়া সরকারের বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা চালুই হয়নি এমন কম্যুনিটি স্কুল চালানোর ক্ষেত্রে ব্র্যাক কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে তাও আলোকপাত করা হয়েছে অন্য এক সমীক্ষায়। এছাড়াও বর্তমান সংখ্যা থেকে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত শিক্ষিকা ও কর্মীদের ইংরেজী বিষয়ে জ্ঞানের মাত্রা জানা যাবে।

ঢাকা শহরের অধিকাংশ বস্তিবাসী খুবই দুঃসহ জীবন যাপন করে। তাদের বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। এ ব্যাপারে সরকার বা এনজিওরা কী ভূমিকা নিচ্ছে এবং এতে তাদের কতটুকু চাহিদা পূরণ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা রয়েছে একটি নিবন্ধে।

স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশে এইডস ব্যাপকভাবে বিস্তার না করলেও এর ব্যাপক বিস্তারের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এইডস সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ কতটুকু সচেতন এবং এ থেকে বাঁচার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তাও আলোকপাত করা হয়েছে একটি গবেষণায়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জানা যাবে এ সংখ্যায়।

ঋণ কর্মসূচি দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই ঋণ কর্মসূচি দরিদ্রদের পিতৃতান্ত্রিকতায় কী ভূমিকা রাখে বা আদৌ কোন ভূমিকা রাখে কিনা এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে একটি সমীক্ষায়। তাছাড়া ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে কেন কিছু সদস্য লাভবান হতে পারছে না তার ব্যাখ্যা রয়েছে একটি নিবন্ধে।

সরকার ও এনজিও-রা দেশের উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই দু'য়ের সম্পর্ক কেমন, সম্পর্ক উন্নয়নে তারা কী করছে এবং আরও কী কী করা যেতে পারে এ সম্পর্কিত একটি গবেষণার ফলাফল স্থান পেয়েছে এ সংখ্যায়।

এটি নির্যাসের ১০ম খণ্ড। এ খণ্ডে ১৯৯৯ সালের গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি রিপোর্টের বাংলা সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

নির্যাস প্রকাশের শুরু থেকেই আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন কর্মীদের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পাচ্ছি এবং এই পরামর্শের ভিত্তিতে নির্যাস উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। তাই নির্যাস সম্পর্কে আমরা আপনাদের মূল্যবান মতামত আশা করছি। নির্যাসের এই সংখ্যাটিতে সম্পাদনা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমাদের সহকর্মী ব্র্যাকের নির্বাহী সহকারী জনাব তারিক আলীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদক

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে স্কুল গমনের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা অর্জন*

আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, সমীর রঞ্জন নাথ ও রাশেদা কে চৌধুরী

নিকট অতীতে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত এসব উদ্যোগের ফলে শিক্ষার অভ্যন্তরীন দক্ষতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতির সূচনা হয়েছে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উদ্যোগগুলো বেশ স্পষ্ট হতে থাকে। উদ্যোগ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন,
- যোগ্যতা (Competency) ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন,
- জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান,
- মেয়েদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান,
- পৃথক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গঠন,
- শিশু অধিকার সম্মেলন এর আলোকে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন, এবং
- সরকার কর্তৃক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক ব্যাপক সংখ্যক উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল চালু।

এই রচনায় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম এবং জাতি পরিচয় ভেদে শিশুদের স্কুল

---

*'Enrolment at primary level: gender difference disappears in Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সমীর রঞ্জন নাথ।

গমনের ক্ষেত্রে কোন লিঙ্গ বৈষম্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা। এজন্য এডুকেশন ওয়াচ[·] ১৯৯৯-এর তথ্য (১৯৯৮ সালে সংগৃহীত) ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াচ প্রকল্পে বাংলাদেশের ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগের গ্রামাঞ্চলগুলোকে নিয়ে ছয়টি এবং মহানগরসমহ ও পৌরসভাগুলোতে দু'টি সহ মোট আটটি পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। সারাদেশের ৩১২টি গ্রাম/মহলার ৪২,৫৮৪টি খানা থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশেষণ করে বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে।

তথ্য বিশেষণে দেখা গেছে বাংলাদেশের শিশুদের প্রাথমিক স্কুল গমনের গ্রস হার[&] গড়ে ১০৭, মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ১০৯ আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ১০৪। এলাকা অনুসারে খুলনা বিভাগের গ্রামীণ এলাকায় এই হার সর্বোচ্চ (১১৭) আর মহানগরীগুলোতে সর্বনিম্ন (১০১)। প্রাথমিক স্কুলে গমনের গ্রস হার গ্রামীণ এলাকায় গড়ে ১০৮ আর শহর এলাকায় গড়ে ১০৫। গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকাতেই মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বেশি হারে স্কুলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র গ্রামীণ চট্টগ্রাম এলাকা ছাড়া প্রতিটি বিভাগেই মেয়েদের স্কুলে গমনের হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। গ্রামীণ চট্টগ্রামে ছেলেরা এক শতাংশ হারে এগিয়ে রয়েছে। শ্রেণীভিত্তিক তথ্য বিশেষণে দেখা গেছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেদের এই হার মেয়েদের তুলনায় সামান্য বেশি। অন্যদিকে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে এই হারে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে।

স্কুলের ধরন অনুসারে তথ্য বিশেষণে দেখা গেছে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রী সরকারি প্রাথমিক স্কুলসমহে লেখাপড়া করে, বেসরকারি স্কুলসমহে যায় প্রায় ১৫%। এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলসমহে ৮.৫%, মাদ্রাসায় ৫.৯%, আর বাকীরা যায় কিন্ডার গার্টেন অথবা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক স্কুলে। যদিও প্রায় সব ধরনের স্কুলেই ছাত্র এবং ছাত্রীদের অনুপাত প্রায় সমান কিন্তু উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলসমহে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের প্রায় দেড়গুণ, অন্যদিকে মাদ্রাসার চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

[·] বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উপর নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষণ করে প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে এর যাত্রা শুরু। এ পর্যন্ত তিনটি ওয়াচ অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে দুইটি।

[&] প্রতি ১০০ জন শিশুর (৬-১০ বৎসর বয়সী) বিপরীতে যে কোন বয়সী কত জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক স্তরে রয়েছে।

স্কুল গমনের নীট হার পাওয়া গেছে ৭৭.১%, অর্থাৎ ৬-১০ বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েদের প্রতি ১০০ জনে ৭৭.১ জন বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে। এই হার ছেলেদের ক্ষেত্রে ৭৫.৫% আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭৮.৬%। গ্রামীণ ও শহর এলাকায় স্কুলে গমনের নীট হার যথাক্রমে ৭৬.৮% ও ৭৯%। এ ক্ষেত্রে যদিও শহর এলাকায় কোন লিঙ্গ বৈষম্য পাওয়া যায়নি কিন্তু গ্রামীণ এলাকার মেয়েদের মধ্যে স্কুলে গমনের হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। গ্রামীণ যেসব এলাকায় মেয়েদের স্কুলে গমনের হার ছেলেদের তুলনায় বেশি সেগুলো হলঃ ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল। মেয়েদের অবস্থা সবচেয়ে ভাল খুলনার গ্রামাঞ্চলে আর সবচেয়ে খারাপ চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে।

পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির সংগে ছেলে-মেয়েদের স্কুল গমনের সম্পর্ক রয়েছে, আর্থিক সঙ্গতি বাড়ার সাথে সাথে স্কুলে গমনের হারও বেড়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল দরিদ্র পরিবারগুলোতে মেয়েদের স্কুল গমনের হার ছেলেদের তুলনায় বেশি, আর স্বচ্ছল পরিবারগুলোর চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্য এই চিত্রটি গ্রামাঞ্চলে যতটা প্রকট শহরাঞ্চলে ততটা নয়। আরও দেখা গেছে স্বল্প শিক্ষিত কিংবা কোন দিনই স্কুলে যায়নি এমন মায়েদের মধ্যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বেশি, যদিও শিক্ষিত মায়েদের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়নি। শহরাঞ্চলে সব ধরনের মায়েরাই ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে গমনের হার অমুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। মুসলিম পরিবারে মেয়েদের স্কুলে গমনের হার বেশি। আর অমুসলিম পরিবারে ছেলেরা বেশি হারে স্কুলে যায়।

১৯৯৩ এবং ১৯৯৮ সালের তথ্য তুলনা করলে দেখা যায় ১১-১২ বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্কুলে গমনের নীট হার বেড়ে ৭৭% থেকে ৮১% হয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ১৯৯৩ সালে ছিল ৭৪% যা বেড়ে ১৯৯৮ সালে দাড়িয়েছে ৮৪%। অন্যদিকে ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালে ছিল ৮০% আর ১৯৯৮ সালে এই হার কমে দাড়িয়েছে ৭৮%।

উপরোক্ত তথ্য বিশেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে শিশুদের স্কুল গমনের হার বেড়েছে, যদিও এখনো উপযুক্ত বয়সী ছেলেমেয়েদের ২৩% স্কুলের দোড়গোড়ার বাইরেই রয়েছে। স্কুল গমনের হার বৃদ্ধিতে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে, এটা অত্যন্ত সুখের কথা। এই বৃদ্ধির হার যদি ধরে রাখা সম্ভব হয় তবে বাংলাদেশের মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে একটা শক্ত

ভিত্ রচিত হবে। আমরা যে গ্রস হার পেয়েছি তা সরকার প্রদত্ত গ্রস হারের চেয়ে বেশি। একটা বিষয় লক্ষণীয়, বেশিরভাগ দক্ষিণ এশীয় দেশে গ্রস এবং নীট হারে পার্থক্য ২০% এর বেশি নয় যা আমাদের ক্ষেত্রে প্রায় ৩০%। এটি এক দিক থেকে ভাল এই কারণে যে প্রাথমিক শিক্ষার বয়স পার হয়ে গেছে এমন ছেলে-মেয়েরাও এখন শিক্ষা গ্রহনের জন্য স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। অর্থাৎ উপযুক্ত বয়স হারালেও শিক্ষিত হবার সুযোগ এদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু উপযুক্ত বয়সী যে ২৩% এখনো স্কুলে যাচ্ছে না এদের দিকে নজর দেয়া দরকার, তা নাহলে এরাও বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি হতে যাবে। জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণে গ্রস এর চেয়ে নীট এর দিকে জোর দেয়া উচিত।

স্কুলে ভর্তির হারে যে অগ্রগতি তা সম্ভব হয়েছে কয়েকটি বিশেষ গ্রুপের প্রচেষ্টার ফলে। গ্রামীণ জনগণ, দরিদ্র পরিবার এবং স্কুলে যায়নি বা স্বল্প শিক্ষিত এমন মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ব্যাপকহারে স্কুলে পাঠানোর ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রেও এদের অবদান ব্যাপক। এখন দরকার এই অর্জনকে ধরে রাখার। এ ক্ষেত্রে সরকারকে নিতে হবে বলিষ্ঠ ভূমিকা, কারণ বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে এখনো সরকারি প্রাথমিক স্কুলেই ভর্তি হয়। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে এনজিও সমূহকে, কারণ এদের স্কুলে এখনো নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

ব্র্যাক স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের শিখন পরিমাপ*

মো. আলতাফ হোসেন, শাহিন আখতার ও মো. আবুল কালাম

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এক হাজার ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষার্থীদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। এ উদ্যোগের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ব্র্যাক স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ বিষয়ক একটি সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাক স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান যাচাই করা।

ব্র্যাকের ৪টি অঞ্চলের ৩০টি এলাকা শিক্ষা অফিস থেকে ১টি করে টিম অফিস নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি টিম অফিস থেকে ২টি করে স্কুল এবং এ ২টি স্কুল থেকে ৭ জন ছেলে ও ৭ জন মেয়ে নির্বাচন করা হয়। এভাবে মোট ৪২০ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের শিখন পরিমাপের জন্য বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে মোট পাঁচটি প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের ফলাফলের উপরে অন্যান্য বিষয়ের প্রভাব পরিমাপের জন্য দু'টি পৃথক প্রশ্নপত্র (একটি শিক্ষিকার জন্য এবং অন্যটি শিক্ষার্থীদের পিতামাতার জন্য) তৈরী করা হয়।

গবেষণায় দেখা যায় যে, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এবং বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত গড় নম্বর যথাক্রমে ৬৪.৪, ৫৪.৬ এবং ৪৬.৭ যা তুলনামূলকভাবে ইংরেজী এবং গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩৪.৫ এবং ৩৩.৯) থেকে বেশি। তবে এই গড় নম্বর প্রাপ্তিতে ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

---

*'Learning achievement of the students after completion of grade five from BRAC schools' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. আলতাফ হোসেন।

ফলাফল থেকে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৭৯ জন শিক্ষার্থী সব বিষয় মিলিয়ে ৩৩% নম্বর পেয়েছে। তবে প্রতিটি বিষয়ে আলাদাভাবে পাস করেছে (পাস নম্বর ৩৩ শতাংশ) এরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০%। শতকরা ৬০ নম্বর পেয়েছে এরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১ শতাংশ, ৪৫-৫৯% নম্বর পেয়েছে শতকরা প্রায় ৩০ জন শিক্ষার্থী এবং ৩৩-৪৪% নম্বর পেয়েছে প্রায় ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে বিজ্ঞান বিষয়ে এবং সবচেয়ে কম শিক্ষার্থী পাস করেছে গণিত বিষয়ে। শিক্ষার্থীদের ফলাফল বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, রাজশাহী, যশোর এবং জামালপুরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ঢাকা অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা তুলনামলকভাবে ভাল করেছে। পক্ষান্তরে ফেনী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা সবচাইতে খারাপ করেছে।

বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ভাল করেছে বাক্য তৈরী ও শ্রুতিলিপিতে এবং তুলনামলকভাবে খারাপ করেছে চিঠি, রচনা, এবং বিপরীত শব্দ লেখাতে। একইভাবে ইংরেজীতে শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা, একটি অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর লেখা, এবং শ্রুতিলিপি লেখার তুলনায় ঠিকানা লেখা, সংখ্যাকে কথায় লেখা ও ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তুলনামলকভাবে ভাল করেছে।

সমস্যার অংকের সমাধানে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ১০ জন শিক্ষার্থী সঠিকভাবে সমস্যার অংক সমাধান করতে পেরেছে। তবে সহজ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ভাল করেছে। তাছাড়া দুর্বলতা দেখা গেছে ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ করার ক্ষেত্রে।

প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা লেখার দক্ষতার তুলনায় বেশি অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে শুনে লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। ইংরেজী বিষয়ে ঠিক একই ধরন লক্ষ্য করা গেছে, যদিও বাংলার তুলনায় ইংরেজীতে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের হার অনেক কম।

গণিত বিষয়ে যোগ্যতা বিশেষণ করলে দেখা যায় ভাগ অংক করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তুলনামলকভাবে ভাল করলেও সমস্যার অংকের ক্ষেত্রে এ অর্জন ছিল সর্বনিম্ন। আর বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বাংলা, ইংরেজী, ও অংকের তুলনায় ভাল।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার উপর অন্যান্য বিষয়ের প্রভাব সংক্রান্ত বিশেষণ থেকে জানা যায় যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত

যোগ্যতার সাথে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের একটি ইতিবাচক সম্1র্ক রয়েছে। নতুনদের তুলনায় পুরাতন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পড়েছে এরকম শিক্ষার্থীদের ফলাফল অপেক্ষাকৃত ভাল। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের রেডিও, টিভি এবং দৈনিক সংবাদপত্রের সাথে যোগাযোগ তাদের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশে কম্যুনিটি স্কুলের অবস্থা পর্যালোচনা*

মো. আবুল কালাম ও আবদুলাহেল হাদী

সরকারের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা হচ্ছে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনে ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কম্যুনিটি স্কুল কার্যক্রম হচ্ছে এরকম একটি যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা চালুই হয়নি এমন ৬৭টি কম্যুনিটি স্কুল পরিচালনার জন্য ব্র্যাকের নিকট হস্তান্তর করে। এসকল স্কুলের ৩৩টি ব্র্যাক ইতিমধ্যে চালু করেছে। এ গবেষণায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা চালু হয়নি এমন কম্যুনিটি স্কুলের অবস্থা পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যার উদ্দেশ্য হল কম্যুনিটি স্কুলের বর্তমান ও পর্বের অবস্থা জানা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মান সম্পর্কে অবগত হওয়া, শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল তৈরী, কম্যুনিটি স্কুল না চলা বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যৎ মল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা।

দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ব্র্যাকের নিকট হস্তান্তরিত সকল স্কুল এবং এসকল স্কুলের নিকটবর্তী সরকারি তত্ত্বাবধানে কম্যুনিটি দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলোর মধ্য থেকে ২৮টি স্কুল এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব স্কুলের মধ্য থেকে ১২টি স্কুলের উপর কেস্ স্টাডি করা হয়। ব্র্যাক পরিচালিত ৩৩টি ও সরকারি তত্ত্বাবধানে কম্যুনিটি পরিচালিত প্রতিটি স্কুল থেকে ১৩ জন করে ছাত্র-ছাত্রী দৈবচয়নের মাধ্যমে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়। এ গবেষণায় ছাত্র-ছাত্রী, তাদের পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য, ব্র্যাকের কর্মী, উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং কম্যুনিটির অন্যান্য সদস্যদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

---

*'An analysis of the situation of community schools in Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. আবুল কালাম।

গবেষণায় দেখা যায় যে, অন্য কম্যুনিটি স্কুলের তুলনায় ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলে সুযোগ-সুবিধা (পায়খানা, পানীয় জল), শৃ-খলা, স্কুল ভবনের অবস্থা, স্কুল পরিচালনা কমিটির কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি (৯৩%), ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (৪৬:৫৪) ভাল, এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনও সহযোগিতামলক। তারপরেও ব্র্যাক পরিচালিত কয়েকটি কম্যুনিটি স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়নি এবং উলেখযোগ্য সংখ্যক স্কুলে নিজস্ব পায়খানা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।

শ্রেণীতে গড়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ব্র্যাক পরিচালিত ও সরকারি তত্ত্বাবধানে কম্যুনিটি পরিচালিত উভয় স্কুলে প্রায় সমান। তবে শিক্ষক সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতের বিচারে ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলের অবস্থা (১:৩৩) অন্য কম্যুনিটি স্কুলের (১:৪৬) তুলনায় ভাল।

গড় শিক্ষা (১০.৯ বছর) ও শিক্ষকতা অভিজ্ঞতার (০.৭ বছর) বিবেচনায় দেখা গেছে ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যোগ্যতা অন্য কম্যুনিটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তুলনায় কম। ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার গড় শিক্ষা কম এ কারণে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্র্যাক মহিলাদের (৯৫%) প্রাধান্য দিয়েছে। নিয়মানুসারে যেহেতু সরকারি প্রাইমারী স্কুলে মহিলাদের শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ পেতে তুলনামলকভাবে কম শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় তাই ব্র্যাকও তুলনামলকভাবে কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্ন্ন মহিলাদের শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। তাছাড়া উভয় স্কুলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে খুবই কম সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার আনুষ্ঠানিক মৌলিক প্রশিক্ষণ রয়েছে।

মা-বাবার শিক্ষা, খানার আর্থিক ও বাড়ী-ঘরের অবস্থার বিচারে ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের অবস্থা সরকারি তত্ত্বাবধানে কম্যুনিটি পরিচালিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় খারাপ। তাছাড়া ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি তত্ত্বাবধানে কম্যুনিটি পরিচালিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বেশি বয়সের।

ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলের পরিচালনা ও মানের ব্যাপারে এলাকার লোকেরা অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তবু তাদের বক্তব্য থেকে কিছু সমস্যা বেরিয়ে এসেছে, যেমন স্কুল পরিচালনা কমিটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ফি আদায় এবং অন্য প্রাথমিক স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এসে ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলে ভর্তি করা।

গবেষণায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন কারণের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার না হওয়া ও স্থানীয় রাজনীতি কম্যুনিটি স্কুল চালু না হওয়া কিংবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে মখ্য ভূমিকা পালন করে। কম্যুনিটির লোকদের মধ্যে তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের মতৈক্য সুষ্ঠুভাবে কম্যুনিটি স্কুল পরিচালনায় মল উপাদান হিসাবে কাজ করে।

ব্র্যাক পরিচালিত সব কম্যুনিটি স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং নিজস্ব পায়খানা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ফি আদায়, এবং অন্য প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্র্যাক পরিচালিত কম্যুনিটি স্কুলে ভর্তি করা, এসব বিষয়গুলো সম্পর্কে ভাবা দরকার।

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইংরেজী বিষয়ে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নিরূপণ*

সানিয়া সুলতান, মো. কায়সার আলী খান, ও সৈয়দা র মনাজ ইমাম

মানব সম্1দ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুর ত্বপর্ণ। তাই শিক্ষাকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসচি চালু করে, যা অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছে। এই গবেষণার মল উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাক স্কুলের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের জন্য নতুন প্রণীত ইংরেজী বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা মল্যায়ন করা যা ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসচির উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট প্রদত্ত প্রশিক্ষণ মান বজায় রেখে মাঠ পর্যায় পর্যন্ পৌঁছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ও সমাজ বিজ্ঞানে সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় ভাল করলেও অংক এবং ইংরেজীতে বেশ দুর্বল। এজন্য তারা সরকারি স্কুলে ভর্তি হলেও বেশ সমস্যায় পড়ে। এ কথা বিবেচনায় রেখে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসচির স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে সরকার প্রণীত ইংরেজী বই পাঠ্য করে এবং পাঠদানের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করে। এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল গতানুগতিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আমল পরিবর্তন এনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরও আধুনিক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

এ উদ্যোগ বাস্বায়নের জন্য ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসচি তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য বই এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সহায়িকা তৈরী করে যার ধাপ ৬টি, যেমন, বিষয়বস্তু সম্1র্কে ধারণা প্রদান, বই পড়া, বানান, চর্চা, মল্যায়ন ও লিখা।

উক্ত প্রশিক্ষণ মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্র্যাকের উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট ধারাবাহিক কিছু প্রক্রিয়া শুর করে। যেমন, কর্মসচির মাঠ পর্যায় হতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীদের মাষ্টার ট্রেইনার (এমটি)

---

*'Effectiveness of teachers training in BRAC schools' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. কায়সার আলী খান।

প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করে তাদের কয়েক ধাপ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে তৈরী করে, যাদের পরবর্তীতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরাসরি প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত পাঠদান কৌশল দ্রুত মাঠপর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাষ্টার ট্রেইনাররা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান শুরু করে। পরবর্তীতে কর্মীরাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাসিক রিফ্রেশার্স প্রদান করে। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পৌঁছে, তাই সঠিক মান বজায় রেখে তাদের কাছে পৌঁছে কিনা তা যাচাই করাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ, মতামত জরিপ, প্রশ্নপত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীদের সাথে দলীয় আলোচনা ও প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান যাচাই করার জন্য পরীক্ষা নেয়া হয়। এ জন্য গবেষকগণ উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক মাষ্টার ট্রেইনারদের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স, মাষ্টার ট্রেইনার কর্তৃক কর্মীদের তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মী কর্তৃক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিনটি রিফ্রেশার্স এবং ছয়টি স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদান কৌশল পর্যবেক্ষণ করেন।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক মাষ্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ এবং মাষ্টার ট্রেইনার কর্তৃক কর্মীদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সন্তোষজনক। কিন্তু কর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রিফ্রেশার্স ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্কুলে পাঠদানের মান বজায় রাখতে পারেনি। গবেষকদের পর্যবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রশিক্ষণের কৌশল একেবারেই নতুন এবং ইংরেজী বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ অতটা ফলপ্রসূ হয়নি। তাছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীরা ইতিপূর্বে প্রণীত পাঠদান পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। তাছাড়া প্রশিক্ষণের কৌশল নতুন হওয়া সত্ত্বেও সময়কাল ছিল অত্যন্ত সীমিত।

এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষকগণ মনে করেন যে, উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সহায়িকা আরও সহজ করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রশিক্ষণের ৬টি ধাপকে আরও সহজ ও প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এই গবেষণার ফলাফল উপকরণ উন্নয়ন ইউনিটকে প্রশিক্ষণ আরও ফলপ্রসূ করার দিক নির্দেশনা দিবে। তাই প্রতিবেদন শেষ হবার পূর্বেই উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট শিক্ষক সহায়িকা ও প্রশিক্ষণের কাঠামো পরিবর্তন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসচিতে মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইংরেজী বিষয়ের উপর জ্ঞানের মাত্রা মল্যায়ন*

মো. কায়সার আলী খান

ব্র্যাক বাংলাদেশ সরকারের সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে দুই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসচি শুর করে। প্রথম ধরনের স্কুল শুর করে ১৯৮৫ সালে এবং দ্বিতীয় ধরনের ১৯৮৮ সালে যা যথাক্রমে তিন ও দুই বৎসর মেয়াদী। প্রথম ধরনের প্রকল্পের নাম এনএফপিই যা ৮-১০ বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য এবং দ্বিতীয় ধরনের প্রকল্পের নাম কিশোর-কিশোরী যা ১১-১৪ বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য। ব্র্যাকের স্কুল সমহে সাধারণতঃ দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করা হয়, যারা আদৌ কোন স্কুলে ভর্তি হয়নি কিংবা ভর্তি হলেও মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের পর্বেই স্কুল ত্যাগ করেছে বা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। ব্র্যাক স্কুলের তিন বৎসরের শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ আনুষ্ঠানিক স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী তাদের ভর্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয়।

ব্র্যাকের এই শিক্ষা কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মল স্রোতধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ১৯৯৭ সালে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে ব্র্যাক তার স্কুলের মেয়াদ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। আশা করা হয় যে ছেলে-মেয়েরা ব্র্যাক স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে আনুষ্ঠানিক স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ব্র্যাক এই পরিবর্তিত কার্যক্রম পরীক্ষামলকভাবে মোট একহাজার স্কুলে শুর করে। এই পর্যায়ে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসচি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে অবগত হয় যে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী ও অংকে আনুষ্ঠানিক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে তুলনামলকভাবে দুর্বল।

---

*'Assessing cognitive knowledge in English of staff and teachers of BRAC's non-formal primary education programme' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

একথা চিন্তা করে ব্র্যাক স্কুলসমূহে বিশেষ করে ৪র্থ ও ৫ম স্তরে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড প্রণীত তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী বই পাঠ্য করে। বইটিতে মোট ২২টি অধ্যায় আছে যার শিক্ষনীয় বিষয়গুলো হচ্ছে কালের ধারণা, আর্টিকেল, অনুবাদ করা, বাক্য তৈরী এবং বিভিন্ন শব্দ শিখন। ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট টেক্সট বইটির উপর ভিত্তি করে একটি প্রশিক্ষণ গাইড এবং একটি প্রশিক্ষণ মড্যুল তৈরী করে। এই মড্যুলের ভিত্তিতে ব্র্যাক মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে।

উক্ত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ব্র্যাক মাঠ পর্যায়ের কিছু কর্মীকে বাছাই ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাষ্টার ট্রেইনার (এমটি) হিসাবে তৈরী করে যারা পরবর্তীতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স পরিচালনা করবে। উল্লেখ্য যে, কর্মী হিসেবে যাদের মান ভাল তাদেরকে এমটি হিসাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে এমটিরা মাঠ পর্যায়ের কর্মী যারা স্কুল পরিদর্শনের সাথে জড়িত তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। ধারণা করা হয় যে যারা শিক্ষা কর্মসূচির সাথে সরাসরি জড়িত তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সংশিষ্ট বিষয়ের উপর সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন। তাই তাদের জ্ঞানের মাত্রা জানার জন্য এ গবেষণা পরিচালিত হয়।

উক্ত গবেষণায় ব্র্যাক শিক্ষা প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইংরেজী বিষয়ের জ্ঞানের মাত্রা জানার জন্য একটি পরীক্ষা নেয়া হয়। এই গবেষণায় উক্ত পরীক্ষার ফলাফল বিষদভাবে উপস্থাপন ও বিশেষণ করা হয়।

পরীক্ষাটি ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির ৩টি অফিসের মোট ১১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ১৩ জন পিও ও ৫ জন জুনিয়র পিও-র উপর নেয়া হয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাক কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পটভূমি জানা ও ইংরেজী বিষয়ে তাদের জ্ঞানের মাত্রা যাচাই করা।

যেহেতু ব্র্যাকের স্কুল সমূহে টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদিত তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী বই পাঠ্য এবং তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাই পরীক্ষার বিষয়সমূহ এই বই থেকেই নেয়া হয়। উক্ত পরীক্ষায় সর্বমোট ১০০ নম্বর ছিল যা ৩০ মিনিটের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নেয়া হয়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, শিক্ষিকাদের চাকুরীর অভিজ্ঞতা গড়ে ৫ বৎসর যা কর্মসূচি সংগঠক ও জুনিয়র কর্মসূচি সংগঠক অপেক্ষা বেশি। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্মসূচি সংগঠক গড়ে ১৪ বৎসর, জুনিয়র কর্মসূচি সংগঠকগণ গড়ে ১৩.৬ বৎসর এবং

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ গড়ে ১০ বৎসর স্কুল-কলেজে পড়েছেন। অন্যদিকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্মসচি সংগঠক ও জুনিয়র কর্মসচি সংগঠকগণ সবগুলো অধ্যায়ের উপরই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ গড়ে ১০ অধ্যায় পর্যন্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, কর্মসচি সংগঠকগণ মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে গড়ে ৬৪ নম্বর পেয়েছেন। অন্যদিকে জুনিয়র কর্মসচি সংগঠক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পেয়েছেন গড়ে যথাক্রমে ৭৬.৪ ও ৩৯ নম্বর। উক্ত ফলাফলে দেখা যায় যে জুনিয়র কর্মসচি সংগঠকরা কর্মসচি সংগঠক অপেক্ষা বেশি নম্বর পেয়েছেন। কারণ হিসাবে মনে করা হয় যে কর্মসচি সংগঠক এবং জুনিয়র কর্মসচি সংগঠকদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া জুনিয়র কর্মসচি সংগঠকরা সদ্য লেখাপড়া শেষ করে চাকুরীতে যোগদান করেছেন।

প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রে ব্র্যাক কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে দেখা যায় যে, ৩৯% কর্মসচি সংগঠক, ৮০% জুনিয়র কর্মসচি সংগঠক এবং ৪% শিক্ষক-শিক্ষিকা ৭০ এর উপর নম্বর পেয়েছেন। ৩৯% কর্মসচি সংগঠক, ২০% জুনিয়র কর্মসচি সংগঠক এবং ২৩% শিক্ষক-শিক্ষিকা পেয়েছেন ৫১-৭০ নম্বর। অন্যদিকে শতকরা ৮ জন কর্মসচি সংগঠক এবং ৩৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ০-৩০ এর মধ্যে নম্বর পেয়েছেন।

ব্র্যাক কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাপ্ত গড় নম্বরের বিশেষণে দেখা যায় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকুরীর অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষভাবে স্কুল পরিদর্শন, পাঠক্রমের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ক্লাশে পাঠক্রম সমাপ্তকরণের সাথে নম্বর প্রাপ্তির একটা যোগসত্র রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকুরীর অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও ক্লাশে যত বেশি পাঠক্রম সমাপ্ত করেছে সেইভাবে নম্বর ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। তবে কর্মী ও শিক্ষিকাদের পদবীর সাথে নম্বর প্রাপ্তির কোন যোগসত্র পাওয়া যায়নি।

আলোচনার সার্বিক দিক থেকে দেখা যায় যে, ব্র্যাক কর্মীদের গড়ে ১২ বৎরের অধিক স্কুল কলেজের অভিজ্ঞতা থাকলেও তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজীর উপর গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক নয়। তবে সংশিষ্ট গবেষক মনে করেন যে, যদিও কর্মী ও শিক্ষিকাদের জ্ঞান আশাব্যঞ্জক নয় তবুও ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসভাবে চালাতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়। কারণ, কর্মী ও শিক্ষিকারা পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ ও চলমান কার্যক্রম থেকে আরও শেখার সুযোগ পাবেন।

সরকার নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন*

সনৎ কুমার ঘোষ

ব্র্যাক দেশের শিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ শিক্ষা শুধু মানবাধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে না, একই সঙ্গে মানুষকে উন্নয়নের পথও দেখায়। ১৯৮৫ সালে যে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ২২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয় আজ তা প্রায় ৩৪ হাজার স্কুলের মাধ্যমে ১১ লক্ষ দরিদ্র শিশুর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে। বর্তমানে এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্যগুলো হল পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছরে সমাপণ, উন্নত শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকরণ এবং ক্রমশঃ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্রোতের সাথে এই শিক্ষা কার্যক্রমের সম্পৃক্তকরণ। অর্থাৎ আশা করা যায় যে, আগামী দিনে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক শিক্ষায় সরাসরি অংশ নিতে পারবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, ব্র্যাকের বর্তমান উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সরকার নির্দিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ কতটা পূরণ করতে পারছে?

এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ছাত্রছাত্রীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে তার একটি তালিকা সরকার তৈরী করেছে। এতে ৫৩টি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। এগুলোকেই প্রান্তিক যোগ্যতা বলা হয়। যোগ্যতাগুলো আবার শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি শ্রেণীর প্রান্তেই যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা রয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ব্র্যাকের তিন বছরের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র ৫৩টি প্রান্তিক

---

*'An appraisal of the BRAC`s NFPE programme in respect to coverage of terminal competencies specified by the Government of Bangladesh` শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

যোগ্যতার ভিত্তিতে যাচাই করা হয়। এ গবেষণায় মলতঃ শিক্ষা কর্মসচির লিখিত নথিপত্রের উপর নির্ভর করা হয়। এজন্য তিনটি উৎস অর্থাৎ পাঠ্যপুস্ক, পাঠক্রম সঞ্চালক নথিপত্র ও মল্যায়ন সংক্রান্ নথিপত্র নির্বাচন করা হয়। যাচাইয়ের গুণগত ভিত্তি ধরা হয় 'খুব ভাল', 'মাঝামাঝি' ও 'মোটেই নয়' এ তিনটিকে। প্রান্িক যোগ্যতাগুলিকে শিখন ফলাফলের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন, অভ্যাস-আচরণমলক, জ্ঞানমলক ও বিশ্বাস-মনোভাবমলক। মলতঃ লিখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সংশিষ্ট তথ্য সংগৃহীত হলেও প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা নিরূপণের জন্য শ্রেণীশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষিকা, পরিদর্শক, প্রশিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময় করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে,

(১) ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে সরকার নির্দিষ্ট প্রায় সকল প্রান্িক যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করে।

(২) ব্র্যাকের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ পাঠ্যপুস্কসমহ বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে প্রস্তুত। এখানে অভ্যাস-আচরণমলক এবং জ্ঞানমলক সব প্রান্িক যোগ্যতা ভালভাবে বা মাঝামাঝিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং দু'টি বাদে সব বিশ্বাস-মনোভাবমলক যোগ্যতাই যথাযথভাবে প্রতিফলিত। যে দু'টি যোগ্যতা প্রতিফলিত হয়নি সে দু'টি হলো ধর্মীয় মল্যবোধভিত্তিক।

(৩) প্রশিক্ষণ উপকরণসমহ বিষয়ভিত্তিক, বহুমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত। এখানে অভ্যাস-আচরণমলক একটি এবং বিশ্বাস-মনোভাবমলক দু'টি সহ মোট তিনটি যোগ্যতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু বাকী ৫০টি যোগ্যতা যথাযথ ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

(৪) মল্যায়ন সংক্রান্ নথিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, এই অংশটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এখানে অভ্যাস-আচরণমলক ১৯টি, জ্ঞানমলক তিনটি এবং বিশ্বাস-মনোভাবমলক সাতটি যোগ্যতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। অবশ্য জ্ঞানমলক যোগ্যতাগুলো ভালভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে।

(৫) আরও গভীর বিশেষণে দেখা যায়, সরকার নির্দিষ্ট ধারাবাহিক যোগ্যতার মধ্যে মাত্র পাঁচটি এই কর্মসচিতে চর্চা না করা হলেও অতিরিক্ত আরো অন্ত ৬০টি জীবনমুখী যোগ্যতার চর্চা করা হয়।

সবশেষে প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসচির কিছু পরিমার্জনের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে মল্যায়ন পদ্ধতি সংস্কারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ব্র্যাক পাঠাগার ও তার সমস্যাবলী: একটি পর্যালোচনা*

মো. কায়সার আলী খান

গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের সব ধরনের জনগনকে জ্ঞান অর্জন ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্যই ব্র্যাক পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাছাড়া নারী-পুর ষ নির্বিশেষে সবার মধ্যে বিভিন্ন গুর ত্বপর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা, স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সচেতন করে তোলাই পাঠাগার স্থাপনের মল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্র্যাক গ্রাম পর্যায়ে পাঠাগার স্থাপন শুর করে। বর্তমানে পাঠাগারের সংখ্যা ৫৫০টি, সদস্য সংখ্যা ২,৪৪,৫৮৮ জন এবং মোট সদস্যের ৪৩% মহিলা।

বর্তমানে ব্র্যাকের তিন ধরনের পাঠাগার রয়েছে যেমন, সাধারণ পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার ও ছোট পাঠাগার। পাঠাগারের ধরন ভেদে সদস্য সংখ্যা এবং প্রত্যাশিত তহবিলের নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে। সাধারণ পাঠাগারের প্রত্যাশিত সদস্যমাত্রা সর্বনিম্ন ৫০০ জন, এবং মহিলা ও ছোট পাঠাগারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ ও ৩০০ জন। অন্যদিকে তহবিল গঠনের সর্বনিম্ন মাত্রা সাধারণ পাঠাগারের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকা, এবং মহিলা ও ছোট পাঠাগারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে চলিশ ও পঁচিশ হাজার টাকা।

পাঠাগারের জন্য উপযুক্ত ঘর গ্রামবাসী ব্যবস্থা করেন যা সাধারণতঃ ৪০০-৫০০ বর্গফুট হয়ে থাকে। পাঠাগার সাধারণতঃ সপ্তাহে ৬ দিন এবং দিনে ৬ ঘন্টা খোলা থাকে। ব্র্যাক পাঠাগারসমহ স্থানীয় জনগণের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। পাঠাগারের সার্বক্ষণিক সেবা দেয়ার জন্য একজন লাইব্রেরীয়ান নিয়ুক্ত করা হয় যিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক নির্দেশনা মেনে চলেন। এই পাঠাগার সম্1র্কিত

---

*`Analysis of issues and problems of BRAC Pathagar` শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

বিষয় এবং এর সমস্যাবলী যা কর্মসূচির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে জানার জন্য এই গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়।

গবেষণার তথ্যাবলী বিভিন্ন এলাকার মোট ৬টি পাঠাগার থেকে সংগ্রহ করা হয়। কর্মসূচি সংশিষ্টদের নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে ৩টি খুব ভাল এবং ৩টি তুলনামূলকভাবে কম ভাল পাঠাগার নির্বাচন করা হয় (প্রতি ধরনের পাঠাগার হতে ২টি করে মোট ৬টি)। তথ্য সংগ্রহের জন্য সর্বমোট ২৫৮ জন সংশিষ্ট লাইব্রেরীয়ান, সদস্য-সদস্যা, কমিটির সদস্য, শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের সাথে দলীয় ও ব্যক্তিগত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়াও পূর্বের এক সমীক্ষার ২১টি পাঠাগারের তথ্যও এ গবেষণায় সংযোজন করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় ব্র্যাক পাঠাগার সম্পর্কে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধারণা অত্যন্ত ইতিবাচক। তারা মনে করেন এই কর্মসূচি সর্বসাধারণের জ্ঞান অর্জনে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বিশেষ করে তাদের ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনে ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ব্র্যাক পাঠাগার ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। যদিও অধিকাংশ জনগণ এমন ধারণা পোষণ করেন তবুও কিছু কিছু লোক মনে করেন পরীক্ষার কাছাকাছি অথবা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য গল্প বা উপন্যাসের বই ক্ষতিকারক হতে পারে।

গ্রামীণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্র্যাক পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা ব্যক্তিগতভাবে চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের তহবিল গঠন করেন এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় সদস্য সংগ্রহ করে থাকেন। তারা পাঠাগারের জন্য একটা উপযুক্ত ঘরেরও ব্যবস্থা করেন। পাঠাগার স্থাপনের জন্য তারা শুধু অর্থই প্রদান করেন না, পাঠাগার পরিচালনায়ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু ব্র্যাকের অনুদান প্রাপ্তির পরে তাদের সক্রিয়তায় কিছুটা ভাটা পড়ে, তাদের সভা সমূহ বেশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং অনেক সদস্য পাঠাগারের খোঁজ খবর নেন না।

যদিও বেশিরভাগ সদস্য পাঠাগার ব্যবহার করেন, তবুও উলেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য পাঠাগারে মোটেই আসেন না বা পাঠাগার ব্যবহার করেন না। বিভিন্ন পাঠাগারের তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায় গড়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিয়মিত এবং এক-তৃতীয়াংশ অনিয়মিতভাবে পাঠাগার ব্যবহার করে থাকেন। অন্যান্যরা কখনো পাঠাগার ব্যবহার করেন না। আরও দেখা যায় যে, প্রতিনিয়তই নতুন নতুন ব্যবহারকারী বাড়ছে এবং উলেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পাঠাগারের সদস্য নয় এমন অনেক লোকও নিয়মিত পাঠাগারে আসছেন।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, পাঠাগার স্থাপনের প্রথম বৎসর বই লেনদেনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর থেকে তা হ্রাস পায়। কারণ হিসাবে দেখা যায় কেউ কেউ তাদের সদস্য পদ নবায়ন না করায় তাদের নামে বই ইস্যু করা সম্ভব হয় না। ফলে বই লেনদেন কম হয়। তাছাড়া পরীক্ষা এবং লম্বা ছুটির সময়ও বই লেনদেন কমে যায়।

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, হাজিরার ক্ষেত্রে মেয়েদের স্কুলে স্থাপিত পাঠাগারে মহিলাদের এবং ছেলেদের স্কুলে বা সাধারণ স্থানে স্থাপিত পাঠাগারে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি। বেশির ভাগ মেয়েদের স্কুলে স্থাপিত পাঠাগারে পুরুষ বা ছেলেদের প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

পাঠক-পাঠিকাদের পড়ার উপকরণের উপর আগ্রহ ও চাহিদা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায়, যদিও পত্রিকার বিষয়বস্তু অনুযায়ী আগ্রহের ভিন্নতা রয়েছে তবুও সব ধরনের পাঠক-পাঠিকাদের দৈনিক পত্রিকার প্রতি আগ্রহ রয়েছে। বই এর প্রতিও সবধরনের পাঠক-পাঠিকার চাহিদা বা আগ্রহ একরকম নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোটগল্পের বই, ছড়ার বই, কার্টুন, মিনার বই, হাসির গল্প ও রূপকথার গল্পের বই এর প্রতি বেশি আগ্রহী। আর উচ্চ শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকারা ভারতীয় লেখকের বই পেতে আগ্রহী। কবিতার বই, নাটক, বিভিন্ন রচনাবলী ও ভ্রমণ কাহিনীর উপর লেখা বই খুব কম লেনদেন হয়। আবার অনেক পাঠক-পাঠিকা ধর্মীয় বই সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিছু কিছু পাঠাগার প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে না পারায় পাঠাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এমনকি লাইব্রেরীয়ানের বেতনও দিতে পারছে না অথবা অত্যন্ত কম বেতন দিচ্ছে। ফলে পাঠাগার অল্প সময় খোলা রাখা হয় যা অনেক পাঠক-পাঠিকার পাঠাগার ব্যবহারে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

আরও দেখা যায় যে, ব্র্যাক পাঠাগারের প্রচার খুবই কম। যেমন, আশেপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অনেক লোকই ব্র্যাক পাঠাগার সম্পর্কে অবগত নয়। তাছাড়া বেশ কিছু পাঠাগারের সাইনবোর্ডও পাওয়া যায়নি।

গবেষণায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, ব্র্যাক পাঠাগার গ্রামীণ জনগণের মধ্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। তাছাড়া পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদার প্রতি নজর রেখে ও তাদের অবস্থান বিবেচনা করে পাঠাগার সমূহে বই বা অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের শিশুদের মৌলিক শিক্ষার স্তর ও প্রবণতা: ১৯৯৩-১৯৯৮*

সমীর রঞ্জন নাথ ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে নব্বই এর দশকের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব সম্মেলন। এ সম্মেলন বিশ্বব্যাপী মৌলিক শিক্ষার আন্দোলন জোরদার করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মোদ্যোগের সূচনা করে। এতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ সিদ্ধান্ত নেয় যে সবার কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দিকেও জোর দেয়া প্রয়োজন। সম্মেলনে মৌলিক শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারন করা হয়। এতে বলা হয় শিক্ষা হতে হবে জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী যা মানুষকে শেখাবে বাঁচতে, জীবনের মান উন্নয়ন করতে এবং উদ্বুদ্ধ করবে অব্যাহত জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে। সম্মেলনের ঘোষনায় বলা হয় ২০০০ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনোপযোগী বয়সের শিশুদের ৮০ শতাংশের মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ উক্ত সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদানকারী ১৮৭টি দেশের অন্যতম।

সম্মেলন পরবর্তী পুরো দশকব্যাপী বাংলাদেশে ব্যাপক শিক্ষা উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সরকার প্রণয়ন করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রমকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে করা হয় ব্যাপক পরিবর্তন, প্রচলন করা হয় যোগ্যতা ভিত্তিক (competency) শিক্ষা কার্যক্রম। প্রাথমিক শিক্ষার দেখাশুনা করার জন্য গঠিত হয় পৃথক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও চলতে থাকে ব্যাপক শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষ করে এনজিওগুলো প্রচুর সংখ্যক স্কুল চালু করে উপ-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করে।

---

*'Level and trend of basic education of children in Bangladesh:1993-98' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সমীর রঞ্জন নাথ।

শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি চলতে থাকে শিক্ষার মান পরিমাপের উদ্যোগ। শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণাপত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং এর ধারণা অবলম্বন করে ইউনিসেফের সহযোগিতায় ব্র্যাক ১৯৯২ সালে উদ্ভাবন করে মৌলিক শিক্ষার পরিমাপক যা Assessment of Basic Competencies বা ABC নামে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। উক্ত পরিমাপ দ্বারা চারটি বিষয়ে শিশুদের জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করা হয়। বিষয়গুলো হলো- জীবন দক্ষতা, পড়ার দক্ষতা, লেখার দক্ষতা ও গণিত দক্ষতা। যেসব শিশু উপরিউক্ত চারটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে তাদের ন্যনতম মৌলিক শিক্ষা রয়েছে বলে ধরা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নির্যাস এর দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৯৫) দেখা যেতে পারে।

এগারো-বারো বৎসর বয়সী শিশুদের মৌলিক শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য ১৯৯৩ সালের ফেব্রূয়ারী ও ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে দু'টি জরিপ পরিচালিত হয়। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে জাতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত নমুনা জরিপ দু'টিতে যথাক্রমে ২,৫২০ ও ৩,৩৬০ জন শিশুর মৌলিক শিক্ষার মান যাচাই করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই সম সংখ্যক ছেলে ও মেয়ে নেয়া হয়েছিল। এতে গ্রাম ও শহর, উভয় এলাকার শিশুদেরই নেয়া হয়েছিল।

জরিপদ্বয়ে ব্যবহৃত সংজ্ঞানুযায়ী ১৯৯৩ সালে ১১-১২ বৎসর বয়সী শিশুদের ২৬.৭% মৌলিক শিক্ষার চারটি দক্ষতাই অর্জন করতে পেরেছিল, ১৯৯৮ সালে এ হার দাঁড়ায় ২৯.৬%। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরে মৌলিক শিক্ষার মানের বৃদ্ধি ঘটে ২.৯%। গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে এই হার ২৩.৪% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৫% এ পৌঁছায়, অন্যদিকে শহরাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে তা ৫৫.৭% থেকে ৪৮.৪% এ নেমে যায়। যদিও দু'টি জরিপেই মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা ভাল করেছে, কিন্তু ১৯৯৮ সালে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য আগের চেয়ে বেড়েছে। এটা ঘটার অন্যতম কারণ হল এ সময়ে শহরাঞ্চলের মেয়েরা একই এলাকার ছেলেদের তুলনায় খুবই খারাপ মান অর্জন করেছে। উভয় জরিপেই শহরাঞ্চলের শিশুরা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের তুলনায় খুবই ভাল মান অর্জন করেছে।

দক্ষতাসমহের পারস্পরিক তুলনায় দেখা গেছে শিশুদের গণিত দক্ষতা খুব উঁচু মানের। অন্যদিকে জীবন দক্ষতার মান সর্বনিম্ন। জরিপদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে জীবন দক্ষতা ও লেখার দক্ষতার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিশুর জীবন দক্ষতা যেখানে ১৯৯৩ সালে ছিল ৩৫.৬%, ১৯৯৮ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ৪৩.৩%। একই সময়ে লেখার দক্ষতা ৪৪.১% থেকে বেড়ে

৫১.৪% এ উঠে। উলেখ্য, এই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে। শহরাঞ্চলের শিশুদের মানের অবনতি ঘটে পড়ার দক্ষতা ও গণিত দক্ষতায়। তবে সঠিকভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে মানের উন্নতি ঘটেছে তিনটি বিষয়ে: জীবন দক্ষতা, পড়ার দক্ষতা ও লেখার দক্ষতায়, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে দু'টি বিষয়ে: জীবন দক্ষতা ও লেখার দক্ষতায়। উভয় জরিপেই দেখা গেছে, শহরাঞ্চলের শিশুরা জরিপে অন্তর্ভুক্ত চারটি বিষয়েই গ্রামাঞ্চলের শিশুদের তুলনায় ভাল করেছে।

জীবন দক্ষতার অংশ বাদ দিয়ে অন্য তিনটি বিষয়ের (পড়া, লেখা, গণিত) ফলাফল একত্রিত করে যদি 'সাক্ষরতা' পরিমাপ করা হয় তবে দেখা যাবে সাক্ষরতার হার ১৯৯৩ সালে ছিল ৩৯.৬% এবং ১৯৯৮ সালে ৪২.৫%। এক্ষেত্রেও সাড়ে পাঁচ বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ ২.৯%। মৌলিক শিক্ষার মানের মতই এখানেও শহরাঞ্চলের শিশুরা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের তুলনায় বেশ ভাল করেছে। সাক্ষরতার মান বৃদ্ধির হারে গ্রামের শিশুরা এগিয়ে আর শহরের শিশুরা পিছিয়ে পড়েছে।

উভয় জরিপেই দেখা গেছে স্কুলের শিক্ষা গ্রহণের সাথে 'মৌলিক শিক্ষা' ও 'সাক্ষরতা'র হার বৃদ্ধির একটি যোগবোধক সম্পর্ক রয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত যে সব শিশুরা পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেছে তাদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষার হার ছিল ১৯৯৩ সালে ৪১.৭% আর তা বেড়ে ১৯৯৮ সালে দাড়ায় ৫৬.৯%। অনুরূপভাবে সাক্ষরতার হার ১৯৯৩ সালে ৬৪.৯% থেকে ১৯৯৮ সালে ৭৩.৯% এ পৌঁছায়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে পাঁচ বছরের বাধ্যতামলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পরও বাংলাদেশের শিশুদের পক্ষে বিশ্ব সম্মেলনে স্থিরকৃত (অর্জন ৮০ শতাংশ) স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আরও দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলের শিশুদের শহরাঞ্চলের শিশুদের সমান মান অর্জন করতে এক বছর বেশি সময় লাগে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ৮০ শতাংশ শিশুর মৌলিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কত সময় লাগবে। উপরিউক্ত তথ্যের পুন: বিশেষণে দেখা যায় যে যদি সাড়ে পাঁচ বছরে আমরা মাত্র ২.৯% মান বৃদ্ধি করি, অর্থাৎ বছরে এক শতাংশেরও কম, তবে ৮০ শতাংশে পৌঁছতে আমাদের লাগবে আরও ৯৫ বৎসর। অন্যভাবে বলা যায় যদি এ গতিতেই অগ্রসর হই তবে ২০৯৩ সালের পর্বে আমরা উক্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অনুরূপ বিশেষণ আমাদের দেখায় যে ৮০ শতাংশ শিশুর সাক্ষরতা অর্জন করতে আমাদের আরও ৭১ বৎসর সময় লাগবে। অর্থাৎ ২০৬৯

সালের পর্বে ১১-১২ বৎসর বয়সী ৮০ শতাংশ শিশুর সাক্ষরতা অর্জন সম্ভব নয়। আরও দেখা গেছে, যদি সব শিশুকে পাঁচ বছরের শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয় তবে ২০০৬ সালের মধ্যেই মৌলিক শিক্ষার লক্ষিত মান অর্জন করা সম্ভব। বর্তমান বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে পঞ্চম শ্রেণী পাশ ছেলেরা ২০০৩ সালের মধ্যেই লক্ষ্য অর্জন করবে আর মেয়েদের অপেক্ষা করতে হবে ২০১২ সাল পর্যন্ত।

উপরিউক্ত ফলাফল থেকে বাংলাদেশের ১১-১২ বৎসর বয়সী শিশুদের মৌলিক শিক্ষার স্তর সহজেই বোঝা যাচ্ছে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী বয়সের শিশুদের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি এখন স্কুলে যাচ্ছে। যদিও শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার ৬০% এর বেশি নয় তবুও প্রায় ৭৩% শিশু পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করছে। উক্ত তথ্যাবলী থেকে হিসাব করে বের করা সম্ভব যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিশুদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কিছুটা মান সম্মত শিক্ষা অর্জন করে। এক-চতুর্থাংশের কম শিশু তা অর্জন করে নির্ধারিত সময়ে। এ থেকে বোঝা যায় গত এক দশকে ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে উপস্থিত করানোর ক্ষেত্রে আমরা বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছি, কিন্তু মান সম্মত শিক্ষা অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

শিশুদেরকে স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা বাড়লেও তাদেরকে উপযুক্ত বয়সে স্কুলে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে এখনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। শিশুর বয়স ৭/৮ বৎসর হয়ে গেলেও অনেক অভিভাবকই মনে করেন শিশুর এখনো স্কুলে যাবার বয়স হয়নি। শিশুর স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের মনোভাব জাতীয়ভাবে স্থিরকৃত সময়ে লক্ষিত মান অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অবশ্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শিশুর প্রতি স্কুলের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা। যারা স্কুলে আসছে তাদেরকে যথাযথ উপায়ে মানসম্মত শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্যতামলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ শিশুদের স্কুলে গমনের হার বাড়িয়েছে, কিন্তু বাড়ায়নি শিক্ষার মান। এর অন্যতম কারণ হতে পারে আইনে 'শিক্ষার মান' সম্পর্কে কিছুই না বলা। উক্ত আইন সংশোধন করে অথবা নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত দরত্ব কমানো যেতে পারে। এ বিষয়ে তদারকি বাড়িয়ে এবং স্থানীয় জনগণের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর জবাবদিহি করে এর মানোন্নয়নে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

কিশোর-কিশোরীদের জীবনে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসচির প্রভাব*

মো. আলতাফ হোসেন ও মো. আবুল কালাম

ব্র্যাকের প্রধান দু'টি উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নে সাহায্য করাই শিক্ষা কর্মসচির মল লক্ষ্য এবং সেদিক থেকে দেখলে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসচি সামাজিক কর্মসচির অন্তর্ভুক্ত। আর তাই এ কর্মসচির প্রভাব মল্যায়ন করা খুবই প্রয়োজন এজন্য যে, কর্মসচিটি তার নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বা কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নে কতটুকু সফল তা দেখা। এছাড়া যে পরিবেশের উপযোগী করে ব্র্যাক তার শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলছে সেটা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই এ ধরনের মল্যায়নের প্রয়োজন এ কারণে যে, তা কর্মসচির সফলতা বা দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ভালভাবে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বাড়িয়ে দিবে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল কিশোর-কিশোরীদের জীবনে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসচির প্রভাব পরিমাপ করা। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি এলাকা থেকে ১৯৯১ সালে প্রথম কোর্স সমাপ্তকারী কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ১৮ জন শিক্ষার্থীকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় (১২ জন মেয়ে এবং ৬ জন ছেলে)। এই ১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্ধেকই ব্র্যাক স্কুল শেষ করার পর কমপক্ষে ১ বৎসর অন্যান্য স্কুলে পড়াশোনা করেছে। অন্যদিকে একই বয়স, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে ৬ জন মেয়ে ও ৩ জন ছেলে সহ মোট ৯ জন নিরক্ষর শিক্ষার্থী দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনগুলোকে উপলব্ধি করার জন্য চেকলিষ্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং মৌলিক যোগ্যতা মাপার জন্য একটি পরীক্ষা নেয়া হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষণ করলে দেখা যায়, যে সমস্ত কিশোর-কিশোরী ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করেছে তাদের আর্থিক অবস্থা যারা

---

*'Impact of the BRAC education programme on the adolescents' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. আলতাফ হোসেন।

কখনো স্কুলে যায়নি তাদের তুলনায় ভাল। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ১৬ জন ব্র্যাক স্কুল সমাপ্তকারী (দুইজন এখনও ছাত্রাবস্থায় রয়েছে) কিশোর-কিশোরীর মধ্যে ১০ জনই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বনিয়োজিত, অন্যদিকে সব ক'জন নিরক্ষর কিশোর-কিশোরীই দিনমজুর অথবা বেকার। অন্যদিকে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা কিশোর-কিশোরীরা বিশেষ করে ছেলেরা অধিক আয়মলক কাজে নিয়োজিত। কেননা এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশ রাখার দক্ষতা তারা অর্জন করেছে। অন্যদিকে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা কিশোরীরা নিরক্ষর কিশোরীদের তুলনায় বেশি হারে যুগোপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। কেস্ স্টাডি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তাহে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার হারও ব্র্যাক স্কুল সমাপ্তকারীদের বেশি। অন্যদিকে ব্র্যাক স্কুল শেষ করা অধিকাংশ কিশোরী এবং কয়েকজন কিশোর শাকসব্জী চাষের সাথে যুক্ত, অন্যদিকে স্কুলে না যাওয়া কোন কিশোর-কিশোরীই এ কাজে নিয়োজিত নেই।

তাছাড়া দেখা যায় যে, ব্র্যাক স্কুল সমাপ্তকারী কিশোর-কিশোরীরা তুলনামলকভাবে বেশি ঋণ ব্যবহার করছে কিন্তু তারা কেউই মহাজনী ঋণ নেয়নি। অন্যদিকে স্কুলে না যাওয়া কিশোর-কিশোরীদের দুই-তৃতীয়াংশই মহাজনী ঋণ নিয়েছে। যৌতুক প্রদানের ক্ষেত্রে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা এবং স্কুলে না যাওয়া কিশোর-কিশোরীদের ধারণা ও প্রয়োগে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। একইভাবে স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে কেউই ছেলে-মেয়েদের বিয়ের প্রকৃত বয়স (আইনতঃ) কত তা বলতে পারেনি। একজন ব্র্যাক স্কুল গ্রাজুয়েট ছাড়া ৬টি রোগের নাম অন্য কেউ বলতে পারেনি। তাছাড়া অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেনি। তবে নিরাপদ পায়খানা ব্যবহারকারীদের প্রায় সকলেই ব্র্যাক স্কুল গ্রাজুয়েট। স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যকাল ইত্যাদি বিষয়ে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞান স্কুলে না যাওয়া কিশোর-কিশোরীদের তুলনায় বেশি হলেও কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে সবাই একেবারেই অজ্ঞ।

এ গবেষণা থেকে দেখা যায়, ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা মনে করে পরিবারে এবং সমাজে তাদের সম্মান বেড়েছে, কেননা অন্যান্য মহিলারা তাদের কাছে পরামর্শ চাইতে আসে। আবার অনেক ছেলে-মেয়ে তাদের পড়ালেখা দেখিয়ে নিতে আসে এবং অনেকে এখন তাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে। অন্যদিকে স্কুলে না যাওয়া প্রতিটি কিশোরীই মনে করে সমাজে বা সংসারে তাদের কোন গুরুত্ব নেই।

ব্র্যাক স্কুল সমাপ্তকারী সকল কিশোরীই মহিলাদের ঘরের বাইরে যাতায়াতকে সমর্থন করে, যদিও কেউ কেউ মনে করে যে বাইরে যেতে হলে স্বামীর বা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ সদস্যের অনুমতি নেয়া উচিত। কিন্তু স্কুলে না যাওয়া কোন কোন কিশোরী মনে করে "বাইরে গেলে মেয়েরা নষ্ট হয়ে যায়।" তাছাড়া বেশিরভাগ ব্র্যাক স্কুল সমাপ্তকারী কিশোরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কিন্তু স্কুলে না যাওয়া অধিকাংশ কিশোরীরা এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

ব্র্যাক স্কুল সমাপ্ত করে অন্য সরকারি স্কুলে পড়া কিশোর-কিশোরীদের একজন ব্যতীত সবাই ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন (Competent), অন্যদিকে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কিশোর-কিশোরীর ন্যূনতম যোগ্যতা (Basic competency) ছিল। তবে স্কুলে না যাওয়া কোন কিশোর-কিশোরীরই ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল না।

দারিদ্র্য ও পিতৃতান্িকতায় ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা*

মনির ল ইসলাম খান, আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী, আব্বাস ভূইয়া ও এ কে এম মাসুদ রানা

ক্ষুদ্র ঋণ ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসচির মধ্যে অন্যতম। গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের ঋণ কর্মসচিতে অন্র্ভুক্ত করা এই কর্মসচির মল লক্ষ্য। অতীতে ভূমিহীনদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কোন সুযোগ ছিল না, কারণ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পর্ব শর্ত ছিল ঋণ প্রদানকারীর কাছে জমির দলিল জমা রাখা। কিন্তু ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণে এ ধরনের শর্ত না থাকায় ভূমিহীনদের ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র ঋণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন। মতলবে ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসচি শুর হয় ১৯৯২ সালে। চার বৎসর পর ১৯৯৬ সালে ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি গবেষণা প্রকল্পের অধীনে দারিদ্র্য ও পিতৃতান্িকতায় ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা নিরূপণের জন্য একটি গবেষণা হাতে নেয়া হয়। মতলবে ব্র্যাক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছে এমন ৩৫ জন মহিলার উপর এ গবেষণা পরিচালিত হয়। ঋণ গ্রহণ থেকে ঋণের শেষ কিস্ি পরিশোধ পর্যন্ ঋণের প্রকল্প পরিচালনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ, কিস্ি পরিশোধের উপায়, এ কাজে তাদের ভূমিকা এবং দারিদ্র্য ও পিতৃতন্ে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা সম্1র্কে অবহিত হওয়াই ছিল গবেষণার মল উদ্দেশ্য।

গবেষণায় অন্র্ভুক্ত ঋণগ্রহীতাদের একজন স্বামী পরিত্যক্তা, তিনজন বিধবা এবং বাকী ৩১ জন বিবাহিতা। তাদের পাঁচজন ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসচিতে যোগদান করেছে এক বছরেরও কম সময় পর্বে, তিনজন ১-২ বছর, দশজন ২-৩ বছর, বারজন ৩-৪ বছর এবং পাঁচজন চার বছরেরও আগে।

সামাজিক কারণে ব্র্যাক সমিতিতে যোগদান করা অনেক মহিলার জন্য যেমন সহজ ছিল না আবার সবার জন্য একরকমও নয়। যেমন তারা শুনেছেন যে ব্র্যাক বিদেশী সংস্থা যা নিজস্ব ধর্ম এবং সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকারক। তারপরেও যে সকল কারণে মহিলারা ব্র্যাক

* 'Assailing poverty and patriarchy, how does small money fare'? শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম মাসুদ রানা।

সমিতিতে যোগদান করেছেন ঋণ গ্রহণের সুযোগ তার মধ্যে অন্যতম। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় কার পরামর্শে তারা ঋণের আবেদন করেছেন। দেখা যায় যে, পাঁচজন মহিলা নিজের উদ্যোগে, দশজন স্বামীর পরামর্শে, বারজন স্বামীর সাথে যৌথ আলোচনার মাধ্যমে এবং অন্যরা আত্মীয় ও পরিবারের অন্যান্যদের পরামর্শে ঋণের আবেদন করেছেন।

ব্র্যাক গৃহনির্মাণ ও বিভিন্ন আয়মলক কাজের জন্য ঋণ প্রদান করে। ঋণের পরিমাণ সর্বনিম্ন এক হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। গবেষণাভুক্ত বেশির ভাগ মহিলাই ছয় হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণের টাকা কেউ নতুন কোন কাজের জন্য, কেউবা চলমান প্রকল্পের উন্নয়নে ব্যবহার করেছেন। আবার কেউবা অন্যকে ধার দিয়েছেন কিংবা সাংসারিক কাজে খরচ করেছেন। ৩৫ জন মহিলার মধ্যে বেশির ভাগ বলেছেন যে, ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে তারা লাভবান হয়েছেন এবং খুব কম সংখ্যক মহিলাই বলেছেন যে, টাকা খাটিয়ে তারা লাভ করতে পারেননি। ঋণের টাকা দিয়ে তারা যে আয় করেছেন তার ৫০% এর কিছু বেশি পুনরায় বিনিয়োগ, ২০% ভোগ এবং বাকী টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করেছেন।

আয়মলক কাজে স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা ব্যতীত বিবাহিত মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ খুবই কম। তাছাড়া মহিলাদের আয়মলক কাজে অংশগ্রহণ অনেকাংশে নির্ভর করে পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের উপর। বিবাহিত মহিলারা গৃহস্থালী কাজেই বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেন। তারা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠান ঝাড়ু দেয়, থালা-বাসন পরিষ্কার করে, হাঁস-মুরগী ছাড়ে এবং সকালের নাস্তা তৈরী করে সবাইকে খেতে দেয়। আর যাদের ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় তাদেরকে স্কুলে পাঠানোর দায়িত্বও তাদের। যারা আয়মলক কাজে জড়িত তাদের কাজের পরিধি আরো অনেক বেশি। গবেষণায় দেখা যায় যে, ঋণগ্রহীতাগণ তাদের উৎপাদনশীল ও ব্যবসায়িক কাজে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তেন। যে সকল মহিলা তাদের ঋণের টাকা মল পরিকল্পনা অনুযায়ী খাটাতে পারেনি তারাই বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন।

শুধুমাত্র লাভ থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না, ফলে অন্যান্য উৎস থেকেও তাদেরকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়েছে। তাছাড়া ঋণ গ্রহণের এক সপ্তাহ পর থেকেই কিস্তি পরিশোধ করতে হয় বলে তাদেরকে অন্যান্য আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। সাপ্তাহিক কিস্তির আগে অনেক মহিলাই উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে

থাকেন। এমনকি কিস্তির টাকা নিয়ে অনেকের স্বামী এবং শাশুড়ীরা তাদের সাথে ঝগড়াও করেন।

আমাদের দেশের সংস্কৃতি মহিলাদেরকে ঘরের বাইরে কাজকর্মে নিরুৎসাহিত করে। তাছাড়া সারাদিনের গৃহস্থালী কাজ শেষে ঘরের বাইরে চলাচল করার মত সময় তাদের খুবই কম থাকে। সামাজিক কারণে যে সকল স্থানে পুরুষদের তৎপরতা বেশি সেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণে সামাজিক স্বীকৃতি নেই। গবেষণাভুক্ত মহিলারা বলেছেন যে, তারা যখন ব্র্যাক অফিসে যায় তখন মাথা ও শরীর ঢেকে পর্দা করে দলভুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু মহিলাদের ব্র্যাক অফিসে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ঋণ গ্রহণ, সেজন্য স্বামী বা অন্য কোন পুরুষ সদস্য এটাকে বাধা প্রদান করে না। প্রশ্ন থেকে যায় মহিলাদেরকে ব্র্যাক যে ঋণ দেয় এটা কী মহিলাদের সিদ্ধান্ত প্রদান ও কাজে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করে? আপাতদৃষ্টে তা মনে হলেও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ না করলে তা বুঝা যায় না। আমরা যদি দেখি ঋণের ব্যবহারকারী কে, দেখা যাবে ঋণের ব্যবহার করে তার স্বামী, ছেলে কিংবা পুরুষ আত্মীয়রা। ঋণ ব্যবহারে মহিলাদের ভূমিকা খুবই গৌণ।

পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি মহিলাদের গুরুত্ব না দিয়ে পুরুষদেরই অগ্রাধিকার দেয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতাদের বেশ কয়েকজন স্বামী, পুত্র কিংবা আত্মীয়ের কথায় ঋণের আবেদন করেছিল এবং কয়েকজন স্বামীর সংগে যৌথভাবে পরিকল্পনা করেছিল। স্বামীরাই যেহেতু সরাসরি বিনিয়োগের সাথে জড়িত সেজন্য তাদের সিদ্ধান্তই প্রধান। অল্প কয়েকজন মহিলারই শুধু তাদের কাজের উপর পুরো দখল ছিল। যেমন, একজন মহিলার স্বামী ছিল বৃদ্ধ ও অক্ষম সেজন্য সে নিজেই কাজ করত।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে আরও দেখা যায় যে, ব্র্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করে গরীব মহিলারা গাভী ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, চাষাবাদ ও অন্যান্য আয়মলক কাজ করছে। ব্র্যাক থেকে ঋণ নেয়ার পরেও মহিলারা বিশেষ প্রয়োজনে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং মহাজনদের কাছ থেকেও সামান্য ঋণ নিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আয়মলক কাজ থেকে তারা যে আয় করত তা দিয়ে সংসার পরিচালনায় সহায়তা করতে পারলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শিকার। সাংস্কৃতিক কারণেই সমাজে পিতৃতন্ত্রের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় যা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা যায়নি।

দারিদ্র্য বিমোচনে ও পিতৃতন্ত্রের ভার কমাতে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা খোঁজার আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে দারিদ্র্যের ও পিতৃতন্ত্রের বিস্তৃতি এবং গভীরতার কথা। সুতরাং বলা যায় না যে, ক্ষুদ্র ঋণ রাতারাতি দারিদ্র্য বিমোচন করবে। কিন্তু দেখা যায় যে, এই ঋণ ব্যবস্থা দারিদ্র্যের পরিমাণ কমাতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। যেহেতু সবার দারিদ্র্যতা একই রকম নয় সেজন্য সবার দারিদ্র্য বিমোচন সমানভাবে হয়নি। যারা বেশি দরিদ্র ছিল তারা দরিদ্রই থেকে গেছে, পক্ষান্তরে কম দরিদ্ররা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় ব্র্যাকের দরিদ্র সদস্যদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কারণ এ ঋণ তাদেরকে খাদ্য ক্রয়, চাষাবাদ ও ব্যবসা করতে সাহায্য করছে। ব্র্যাক থেকে ঋণ না পেলে এসব কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে হয়ত না খেয়ে থাকতে হত কিংবা আরো দরিদ্র হতে হত। ব্যাংক ঋণের সুযোগ না থাকায় তাদের অধিক হারে মহাজনদের কাছে যেতে হত। সর্বোপরি বলা যায়, ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জরুরী তহবিল গঠনে এবং বিনিয়োগের মলধন যোগাতে খুবই সহায়তা করছে।

বাংলাদেশে অংশগ্রহণমলক গবেষণা পদ্ধতি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল ডেটা বেস: বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা*

আমিনা মাহবুব

পলী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এ জনগণের অংশগ্রহণ দীর্ঘদিন ধরে একটি গুর ত্বপর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে পারটিসিপ্যাটরি র রাল এ্যাপ্রাইজাল (পিআরএ) বা অংশগ্রহণমলক গ্রাম সমীক্ষার ব্যবহার উলেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশে পলী উন্নয়ন এবং কৃষি বিভাগে পিআরএ-র ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। তবে অংশগ্রহণমলক পদ্ধতি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা যায় যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ আশাপ্রদ ফলাফল লাভে সহায়ক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলো তাদের পলী উন্নয়ন ও কৃষি কার্যক্রমে পিআরএ পদ্ধতি ব্যবহার করছে। বর্তমান সমীক্ষায় এই কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা করে পিআরএ ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা ও এই পদ্ধতিতে পলী উন্নয়ন ও কৃষি ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদশীল তথ্য আহরণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

পলী উন্নয়ন ও বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমের সাফল্য ও স্থায়ীত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপক গুর ত্ব অনুধাবন করছে। ফলে এনজিওদের পাশাপাশি সরকারও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমলক পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কৃষি সহায়তা প্রকল্পের কাজ (এএসএসপি) একটি উলেখযোগ্য উদাহরণ।

কৃষকদের চাহিদা মল্যায়ন ও সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে তারা সাধারণতঃ অংশগ্রহণমলক পদ্ধতি ব্যবহার করতো, যাকে বলা হয় 'সমস্যা চিহ্নিতকরণ' (Problem census) পদ্ধতি। প্রতিবছর

---

*'Participatory research methods and gender data base: Bangladesh country paper' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

এএসএসপি পুরুষ ও মহিলা কৃষক দলের সাথে আলাদা আলাদাভাবে বক সুপারভাইজারদের মাধ্যমে চারটি সমস্যা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংগৃহীত তথ্যগুলো সংকলিত করে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কৃষি সম্প্রসারণের কাজে পিআরএ-র প্রয়োগ সরকারি কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় এএসএসপি প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা নিরসনে এএসএসপি, পিআরএ সম্পর্কিত বিভিন্ন গাইড বই ও ভিডিও প্রদর্শন এর ব্যবস্থা নেয়।

বর্তমানে এএসএসপি তাদের কাজে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যথা বক সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের অভাব এবং পর্যাপ্ত মহিলা বক সুপারভাইজারদের অভাব যা মহিলা অংশগ্রহণকে ব্যাহত করে। অবস্থা বিশেষণে এএসএসপি একটি নতুন প্রশিক্ষণ গাইড তৈরী করে এবং প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বক সুপারভাইজারদের সরাসরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়। এই গাইডে ৯টি পিআরএ কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যথা- সামাজিক মানচিত্র, আর্থিক অবস্থার স্তরবিন্যাস, পরিভ্রমণ, দৈনিক সময় ব্যবহার, ঋতুভিত্তিক বৈচিত্র প্রভৃতি। এই অনুশীলনগুলো মহিলা ও পুরুষ দলের সাথে পৃথক পৃথকভাবে করা হবে এবং সংগৃহীত তথ্য স্থানীয় পরিকল্পনায় ভূমিকা রাখবে। এভাবেই একটি জেন্ডার সংবেদনশীল ডাটা বেস গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে যা ভবিষ্যৎ কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে সরকারি কর্মকাণ্ডের চাইতে এনজিও কর্মকাণ্ডে পিআরএ-র ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। ব্র্যাক এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে পিআরএ কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও কৃষি সংক্রান্ত যে সমস্ত গবেষণায় পিআরএ এর ব্যবহার হয়েছিল তা প্রধাণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত।

- ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা নির্ধারণ।
- গ্রাম সম্পর্কিত কিছু মূল তথ্য আহরণ।

পিআরএ ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্র্যাক গভীর নলকূপ ব্যবহারের ফলে এর প্রভাব মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিল। এক্ষেত্রে পিআরএ-র বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে সেচের জনপ্রিয়তা, বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি,

আয় ও কর্মসংস্থানের প্রভাব প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা চালায়। পর্যায়ক্রমে ব্র্যাকের পলী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ বিভিন্ন গবেষণায় ধীরে ধীরে পিআরএ-র ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। রেশমচাষ কর্মসচি ও বাওর কার্যক্রমের উপর গবেষণা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানে পলী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণে বিভিন্ন কেস্ স্টাডিতে পিআরএ-র কৌশলসমহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়, দারিদ্র্য ও সংকটের স্থানীয় সচক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেও পিআরএ কৌশল ব্যবহার করে গবেষণা করা হয়ে থাকে যা পলী উন্নয়ন কার্যক্রমে ভূমিকা রাখে। এসকল গবেষণা সমহে পুর ষ ও মহিলা উভয়ের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়। যেমন,

- এযাবৎকাল পর্যন্ পরিচালিত অংশগ্রহণমলক গবেষণাগুলো পলী উন্নয়ন কর্মসচির মল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কিছু গবেষণা গ্রামের আর্থ-সামাজিক ও কৃষিভিত্তিক মল তথ্য (baseline) জানার উদ্দেশ্যেও পরিচালিত হয়।
- অংশগ্রহণমলক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এখন পর্যন্ জেন্ডার সংবেদনশীল ডাটা বেস স্থাপিত হয়নি যা আমাদের স্থানীয় সম্¹দ, শ্রম বিভাজন, সময় বন্টন, স্থানীয় জ্ঞান প্রভৃতি সম্¹র্কে ধারণা প্রদান করতে পারে। এই তথ্য সমহ জেন্ডার সংবেদনশীল একটি প্রযুক্তিগত পলী উন্নয়ন কার্যক্রম বিকাশে সহায়তা করতে পারে।
- অংশগ্রহণমলক গবেষণা প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

যদিও বাংলাদেশে অংশগ্রহণমলক গবেষণায় মহিলাদের অংশগ্রহণ মোটামুটি সন্োষজনক, তথাপি কয়েকটি গবেষণায় এ ব্যাপারে কিছু সমস্যা প্রতীয়মান হয়েছে। যেমন,

- গৃহকর্মে ব্যস্তার পাশাপাশি অংশগ্রহণমলক গবেষণায় সময় প্রদান মহিলাদের কাছে অতিরিক্ত বলে মনে হয়।
- অংশগ্রহণে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে দরবর্তী স্থানে অধিবেশন হলে মহিলারা উপস্থিত থাকতে পারে না।
- অনেক সময় পুর ষ সহায়তাকারীদের উপস্থিতিতে মহিলারা মতামত প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।

- তাছাড়া তথ্য সংগ্রহকালে সহায়তাকারী পিতৃতান্ত্রিক মল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পক্ষপাতপর্ণ থাকতে পারে, যার ফলে মহিলাদের মতামতকে (বিশেষতঃ কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে) সঠিকভাবে মল্যায়ন করা হয় না।

অংশগ্রহণমলক গবেষণায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গৃহীত হতে পারে। যেমন,

- সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মহিলা সহায়তাকারীদের মাধ্যমে অনুশীলন পরিচালনা।
- মহিলাদের অংশগ্রহণে সহায়ক এমন স্থান ও সময় নির্বাচন।
- মহিলারা যেন তাদের সুবিধামত আসা যাওয়া করতে পারে অধিবেশনগুলোতে সে রকম সুযোগ রাখতে হবে।

অংশগ্রহণমলক গবেষণার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি কার্যক্রম পরিকল্পনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা আনার জন্য কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন,

- তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষণে সমাজের একটি সাধারণ চিত্র আনার পরিবর্তে বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে পুর ষ ও মহিলা দল আলাদা করা বাঞ্চনীয়।
- তথ্য সংগ্রহ থেকে বিশেষণ পর্য ন্ত সার্বিক প্রক্রিয়ায় সমাজের মানুষের অংশগ্রহণ সর্বাধিক কার্যকরী।

এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমলক মল্যায়ন এবং বিশেষণ ও কার্যাবলী একটি কার্যকরী কৌশল হতে পারে যা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগে ভূমিকা রাখে। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামবাসীরা নিজেরা তথ্য সংগ্রহ করে এবং তথ্যসমহ ঐ গ্রামের একটি ডাটাবেস হিসাবে পরিগণিত হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই সমস্যা নির্ধারণ ও বিশেষণ করে থাকে। পরবর্তীতে স্থানীয় সম্1দের উপর ভিত্তি করে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্তকরণ এবং সহায়-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ: একটি পদ্ধতিগত পর্যালোচনা*

সৈয়দ মাসুদ আহমদ

বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে। উক্ত বন্যায় দেশের দুই-তৃতীয়াংশই প্রায় তিন মাস জলমগ্ন থাকে। বন্যায় দেশের ৬৪টি জেলার ৫৫টিই আক্রান্ত হয় এবং এর মধ্যে নদী পারের ৩২টি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বন্যার ফলে মানুষের সহায়-সম্পত্তি ও জীবন-জীবিকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

দেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক এই বিপদের সময়ে দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে ব্র্যাকের গবেষণা বিভাগ একটি তাৎক্ষণিক জরিপ চালায়। বন্যা চলাকালীন দুর্যোগের মধ্যেই এই জরিপ চালানো হয়। বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমন খানাকে চিহ্নিত করে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের একটি চেষ্টা করা হয়। এটা করতে গিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত এবং নতুন গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্যোগের সময় কাজে লাগতে পারে মনে করে সেগুলো এখানে আলোচনা করা হল।

সবচেয়ে প্রথমে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোকে শনাক্ত করতে হবে। সরকারি বিভিন্ন সত্র, সংবাদপত্র এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাঠ পর্যায়ের অফিস থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এটা করা যেতে পারে। এর পরের ধাপে উপরোক্ত জেলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত উপজেলাগুলোকে সর্বাপেক্ষা বেশি, মধ্যম এবং অল্প ক্ষতিগ্রস্ত এই তিনভাগে ভাগ করতে হবে। স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজস্ব বিবেচনার উপরই এ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হবে। ক্ষতির মাত্রা নিরূপণের জন্য

---

*'Identification of flood victims and assessing damage: exploring some methodological issues'. শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন, উপজেলার বন্যা কবলিত এলাকার পরিমাণ এবং কতদিন জলমগ্ন রয়েছে, জীবন ও সহায়-সম্পত্তির ক্ষতি, জলবন্দী মানুষের সংখ্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতি, খাদ্য ও পানির দুষ্প্রাপ্যতা, বন্যা পূর্বকালীন দারিদ্র্য অবস্থা ইত্যাদি। ত্রাণ কাজ শুরু করার জন্য বেশি ও মধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাগুলোকে বেছে নিতে হবে। সবশেষে এই উপজেলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলোকে একইভাবে ভাগ করে সবচেয়ে বেশি ও মধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোতে কাজ শুরু করতে হবে।

কাজ করার জন্য গ্রামগুলো নির্দিষ্ট করার পর একটি ক্ষুদ্র তথ্যসংগ্রহকারী দল (দুই সদস্য বিশিষ্ট) গ্রামটিতে যাবে। দলে এ ধরনের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে ভাল হয়, বিশেষ করে ঐ এলাকার স্থানীয় অধিবাসী হলে আরও ভাল হয়। তাদের মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো অবহিত থাকতে হবে। পথঘাট/এলাকা চিনিয়ে দেয়ার জন্য স্থানীয় অফিসের কর্মী এই দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিভিন্ন উঁচু জায়গা, দালান-কোঠা কিংবা বাঁধ বা পুলের উপর আশ্রয় নেয়া গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের সাথে আলাপ জমাতে হবে। নিজেদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলার পর তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত গ্রামবাসীদের একটু নিরিবিলি স্থানে নিতে হবে। অনেকসময় এরকম জায়গা পাওয়া দুষ্কর হবে। সেক্ষেত্রে দলটি যে নৌকা করে গ্রামে যাবে সেখানেই এই আলাপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে গ্রাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারে এমন লোকদের বাছাই করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাও আলাপে অংশগ্রহণ করে। সম্পূর্ণ আলোচনাটাই হবে অংশগ্রহণভিত্তিক। দলের একজন আলোচনা করবে এবং অপরজন নোট নেবে। অত্যুৎসাহীরা যাতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সম্পর্কে মনগড়া তথ্য না দেয় সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আলোচনা শুরুর জন্য এলাকায় বন্যার বর্তমান অবস্থা, জলবন্দী মানুষের কষ্ট, খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা ইত্যাদি বিষয় বেছে নেয়া যেতে পারে। তারপর ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজে আগাতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত খানা চিহ্নিতকরণ

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে গ্রামের অবস্থাপন্ন খানাগুলোকে শনাক্ত করতে হবে এবং বিভিন্ন সাহায্য ও পুনর্বাসন কাজের আওতা থেকে এদেরকে বাদ দিতে হবে। খানা নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন নিচের খানাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়:

- ভূমিহীন এবং কার্যতঃ ভূমিহীন খানা
- শারীরিক শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন খানা
- আয়-উপার্জনের উপায়সমহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন খানা
- পুরুষবিহীন খানা কিংবা পঙ্গু/অথর্ব পুরুষ সদস্য বিশিষ্ট খানা
- দুঃস্থ (VGD) কার্ডধারী খানা
- ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের খানা

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যেমন শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং অন্যান্যের সাথে আলাপের মাধ্যমে এমন খানাকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। গ্রামের সবচেয়ে দুর্গম এলাকাও যেন হিসাব থেকে বাদ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মহিলা ও শিশুদের কথাও মনে রাখতে হবে। শনাক্তকৃত খানা প্রধানের নাম ও সদস্যসংখ্যাসহ একটা তালিকা তৈরী করতে হবে যাতে পরে গ্রামে সাহায্যের মোট পরিমাণ ঠিক করা যায়।

সহায়-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

তাৎক্ষণিক জরিপের এই অংশটিই সবচেয়ে কঠিন। ক্ষতিগ্রস্ত তিন ধরনের গ্রামের জন্য আলাদা আলাদাভাবে এ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে হবে। প্রতি ধরনের তিনটি করে গ্রাম দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে। জরিপদলে পেশাদার গবেষক অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে তথ্য নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ দুই রকমের হতে পারে, যথা খানার এবং গ্রামের। খানার বাড়ীঘর এবং উৎপাদনশীল সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য উপস্থিত বন্যাদুর্গতদের মধ্য থেকে ৬ থেকে ৮ জন বেসরকারি সংস্থার সদস্যকে বেছে নিতে হবে। এই কয়জন তাদের প্রতিবেশী যতজনের বসত বাড়ী এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ (হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, মল্যবান বৃক্ষ, লাঙ্গল, রিক্সা, মুদী দোকান) সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। ঋণ, কর্জ, খানার ক্ষতিগ্রস্ত অনুৎপাদনশীল সম্পদ (যথা চৌকি, চেয়ার, টেবিল) ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য শুধুমাত্র উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এর জন্য একটা লিখিত ফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহের পর গড় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে হবে। একইভাবে গ্রামের রাস্তাঘাট, বাঁধ, কালভার্ট, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পানীয় জলের উৎস, খাদ্যাভাব, শষ্যের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

সাহায্যের চাহিদা নিরূপণ

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে সাহায্যের ধরন এবং পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র চিহ্নিত দরিদ্র খানার কাছ থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য নিতে হবে। মহিলা প্রধান এবং দুঃস্থ খানার প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে জীবন রক্ষা ও জীবিকার বন্দোবস্ত করা এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের জন্য এই তথ্যের প্রয়োজন আছে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের মধ্যে আশ্রয়, খাদ্য ও পানীয়, মহিলাদের জন্য পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, যোগাযোগ, জরুরী ঔষধ সরবরাহ, ত্রাণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে নগদ টাকা প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া স্বল্প মেয়াদী প্রয়োজনের মধ্যে আছে জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা করা, ঘরের মল্যবান সম্পদ বিক্রি বন্ধ করা, নগদ ঋণের বিকল্প ব্যবস্থা করা, দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি।

প্রলয়ংকরী বন্যার পর দুর্গতদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সহযোগিতা ও পুনর্বাসন কর্মসচি নেয়ার পরিকল্পনার জন্য দ্রুত সঠিক তথ্য প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে বর্ণিত পদ্ধতি ত্রাণকর্মী ও কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। এসব পদ্ধতি অভিজ্ঞতার আলোকে পরিক্ষীত এবং নির্ভরযোগ্য।

বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের মাত্রা ও নিয়ামক*

আবদুলাহেল হাদী

গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী শিশুদের সমস্যা, তাদের অধিকার ও সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ঠ আলোচনা, বির্তক ও পর্যালোচনা হয়েছে এবং অনেক প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ শিশু রয়ে গেছে অভুক্ত, গৃহহীন, শিক্ষাবঞ্চিত এবং তারা চরম দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এশিয়া মহাদেশের ১০ থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় ১৫ শতাংশই শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। এদের অধিকাংশকেই ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষি খামারে, কারখানায় এবং আরো বিপদ সংকুল পরিবেশে।

শিশু অধিকার রক্ষায় বিশ্বব্যাপী আন্দোলন ও অনেক প্রকল্প চালু করা সত্ত্বেও শিশু নির্যাতন যে কমেছে তা বলা যাবে না। বাংলাদেশের প্রায় সব সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিতর্কেই শিশু নির্যাতন রোধ এবং তার প্রতিকারের দাবী উত্থাপিত হয়। মানবাধিকার সংগঠন সহ বেশ কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা শিশু নির্যাতন রোধে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বটে, কিন্তু কেউ জানেনা এদেশের শিশু নির্যাতনের মাত্রা কত গভীর কিংবা কেন শিশুরাই তুলনামলকভাবে বেশি নির্যাতিত হয়ে থাকে। শিশু শ্রমিকরাই অন্যান্য শিশুদের তুলনায় বেশি নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। শিশু শ্রমিকদের মাঝে নির্যাতনের মাত্রা কত গভীর এবং বিচিত্র তা জানা গেলে বাংলাদেশের শিশু নির্যাতনের একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

শহরাঞ্চলের নির্যাতনের চিত্র পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কিছুটা জানা গেলেও গ্রামের নির্যাতিত শিশুরা অবহেলিতই রয়ে যায়। তাই এই গবেষণাটি করা হয় মানিকগঞ্জ এবং জয়পুরহাট জেলার ১৫০টি গ্রামে। ১০ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক ৪,৬৪৩ জন শিশুর কাছ থেকে জানা গেল অনেক অজানা তথ্য, তাদের কষ্ট এবং অভিজ্ঞতার করুন কাহিনী। ব্র্যাকের গবেষকরা এই তথ্য যোগাড় করলেন ১৯৯৫ সালের মে মাসে।

---

*'Child abuse among working children in rural Bangladesh: prevalence and determinants' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

সাধারণতঃ দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই শিশু-শ্রমিক হিসেবে অন্যের বাড়ীতে বা কারখানায় কাজ করে। সব শিশু শ্রমিকরাই যে সুন্দর একটা পরিবেশে কাজ করতে পারে তা নয়। প্রায় ২.৩ শতাংশ শিশু শ্রমিকদেরকে অনৈতিক বা অনুপযুক্ত কাজ করতে বাধ্য করা হয়। প্রায় ৩ শতাংশ শিশু শ্রমিককে তাদের শারীরিক ক্ষমতার বাইরে দীর্ঘ সময় বিরামহীনভাবে কাজ করতে হয়। প্রায় ২ শতাংশ শিশুকে আর্থিকভাবে প্রতারিত বা বঞ্চিত করা হয়।

কারা এই হতভাগ্যের দল? কোন শিশু শ্রমিক সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত? গবেষণায় দেখা গেছে যে নির্যাতিত হওয়ার সম্ভাবনা বয়স বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে যায়। কিন্তু দৈহিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে ঘটে এর বিপরীত ঘটনা। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মাঝে নির্যাতনের মাত্রাটা বেশি হয়ে থাকে। শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সাথেও শিশু নির্যাতনের মাত্রার একটা সম্পর্ক দেখা যায়। যেমন শিশুটি যদি একেবারেই দরিদ্রতম শ্রেণীর হয়, শিশুটির পিতা যদি হয় নিরক্ষর কিংবা শ্রমজীবী তাহলে নির্যাতনের মাত্রাটাও তুলনামলকভাবে বেশি হয়। আবার যে শিশুরা স্কুলে যায় তাদের উপর নির্যাতন তুলনামলকভাবে কম হয়।

শিশু নির্যাতনের বিষয়টি এদেশে সব সময়ই ছিল। বাংলাদেশে বিষয়টি বেশ আলোচিত হয়ে উঠে ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালনকালে যদিও এর আগেও কেউ কেউ শিশু নির্যাতন রোধে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। একটি বিষয় ক্রমাগতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বাংলাদেশের শিশুরা উলেখযোগ্য মাত্রায় নির্যাতনের শিকার এবং এই নির্যাতন তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে সামাজিক আচরণের যে প্রেক্ষাপট তাতে শিশুদের শাসন করার অংশ হিসেবে শিশু নির্যাতনের এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা রয়ে গেছে। ফলে, শিশু নির্যাতনের যে কুফল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে উঠেনা।

শিশু নির্যাতনকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবেই গণ্য করা উচিত। এই সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সম্মিলিত সামাজিক উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই। সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অন্যান্য সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে লাগিয়ে শিশু নির্যাতন রোধ করা অবশ্যই সম্ভব।

ব্যয়ের নিরিখে আয়ের যথার্থতা: ব্র্যাকের কিছু কর্মসচি নিয়ে একটি পর্যালোচনা*

সান্ত্বনা রানী হালদার ও এ এম মুয়াজ্জাম হোসেইন

কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধন (Employment and Income Generation) কর্মসচির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদেরকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ব্র্যাক ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা বৃদ্ধিমলক প্রশিক্ষণ এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্যগত ও কৌশলগত দিকগুলোর উপর পরামর্শ দান এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে থাকে। এই কর্মসচির প্রধান উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি। এই কর্মসচি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের যে ব্যয় হয় তার যথার্থতা প্রমাণ হবে তখনই যখন ঐ কর্মসচির উপকারভোগী সদস্যের সৃষ্ট আয় ব্র্যাকের সদস্য প্রতি ব্যয়ের থেকে বেশি হয়।

বর্তমান গবেষণাটি ব্র্যাকের মিশ্র কার্প মাছ চাষ, ব্রয়লার মুরগী পালন এবং দর্জিকাজ কর্মসচির উপরে পরিচালিত হয়। গবেষণাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কর্মসচির ব্যয়ের নিরিখে আয়ের যথার্থতা যাচাই করা এবং উপকারভোগী পরিবারের জন্য বর্তমান কর্মসচি থেকে অর্জিত মুনাফার হার কেমন তা নিরূপণ করা। এই গবেষণাটির জন্য প্রাথমিক এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত উপাত্ত সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা হয়। এক গবেষণা সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় ১০৬ জন মিশ্র কার্প চাষী, ১০২ জন ব্রয়লার মুরগী পালনকারী এবং ৯৭ জন মহিলা দর্জির কাছ থেকে। সমীক্ষাটি ১৯৯৮ সালের জুন-জুলাই মাসে করা হয়।

মিশ্র কার্প মাছ চাষ ব্র্যাকের মাছ চাষ কর্মসচির মধ্যে অন্যতম। সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ৭১% চাষী মিশ্র কার্প মাছ চাষের জন্য নিজস্ব জলাশয় ব্যবহার করে, বাকী ২৯% অন্যের জলাশয় লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে। শতকরা ৫৮ ভাগ মাছ চাষী এই কাজ নিজে পরিচালনা করে, বাকী ৪২% এর ক্ষেত্রে একাধিক চাষীর

---

* 'Case studies on cost effectiveness of BRAC provided services in selected enterprise' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সান্ত্বনা রানী হালদার।

যৌথ উদ্যোগে কর্মসচি পরিচালিত হয়। প্রায় ২৮% চাষীর ব্র্যাকের সদস্যপদ লাভের আগে থেকেই মাছ চাষের অভিজ্ঞতা ছিল। মাছ চাষে লাভ-ক্ষতির হিসাবে দেখা গেছে যে গড়ে একজন চাষী ১৯৯৭ সালে মাছ চাষ করে ৬,৯৫৬ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। যে সব চাষী ব্র্যাকের মাছ চাষ কর্মসচির আওতায় আসার আগে থেকেই মাছ চাষ করে আসছে সেই সব চাষীর ১৯৯৭ সালের মুনাফা ব্র্যাক মৎস চাষ কর্মসচির আওতায় আসার আগের মুনাফার থেকে ৪,৫৬৯ টাকা বেশি। শতকরা ৯৭ ভাগ চাষী বলেছে যে ব্র্যাকের মাছ চাষ কর্মসচির আওতায় এসে তার আয় আগের তুলনায় বেড়েছে। মুনাফা বাদেও এই কর্মসচির আওতায় এসে তাদের মাছ চাষ সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা জন্মেছে যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে আয়ের নিশ্চয়তা দেবে। উৎপাদিত মাছ বিক্রির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার কারণে তাদের বাজার অর্থনীতির উপর একটা ধারণা জন্মেছে। বাড়তি আয়ের ফলে তারা কিছু সম্পদ ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদের পরিবারে মাছ খাওয়া আগের তুলনায় বেড়েছে।

এক হিসাবে দেখা গেছে যে ব্র্যাকের মিশ্র কার্প চাষ কর্মসচি পরিচালনা করতে চাষী প্রতি ব্র্যাকের গড়ে বছরে ৩৩৫.৭৫ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে একজন চাষী বছরে ব্র্যাকের এই কর্মসচি থেকে সেবা পাওয়ার জন্য ব্র্যাককে ২০১.৪৫ টাকা সার্ভিস চার্জ দেয়। একজন চাষী বছরে যে অতিরিক্ত মুনাফা করে তা তার এই দেয় টাকার থেকে ২২.৩ গুণ বেশি। এর অর্থ হলো যদিও ব্র্যাক বর্তমানে তার খরচের বিরাট একটা অংশ ভর্তুকি দিচ্ছে কিন্তু অদর ভবিষ্যতে ব্র্যাকের পক্ষে তার সম্পূর্ণ ব্যয় পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব হবে।

ব্রয়লার মুরগী পালন তুলনামলকভাবে ব্র্যাকের জন্য একটা নতুন কর্মসচি। ব্র্যাক ১৯৯৬ সালে মানিকগঞ্জে স্বল্প পরিসরে কর্মসচির কাজ পরীক্ষামলকভাবে শুর করে। পরবর্তীতে গাজীপুর, নরসিংদী, টাংগাইল ও কুমিলা জেলায় অর্থাৎ ঢাকার আশেপাশের জেলাগুলোতে এর ব্যাপ্তি ঘটে। যেহেতু মুরগীর মাংস গ্রামের মানুষের জন্য মাংসের প্রধান উৎস এবং বাংলাদেশের মানুষ শারীরিক চাহিদার তুলনায় মাত্র এক দশমাংশ মাংস গ্রহণ করে মলতঃ সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে, সেহেতু এটা আশা করা হয়েছিল যে ব্রয়লার মুরগী পালন কর্মসচির প্রসার লাভের মাধ্যমে চাহিদা এবং সরবরাহের মাঝের এই বিরাট পার্থক্য কমাতে সক্ষম হবে। সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ব্রয়লার মুরগী পালনকারী পরিবারগুলো অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর স্বচ্ছল। একটা ব্রয়লার পালনকারী পরিবার গড়ে ১.০৫ একর জমির মালিক। প্রায় ২৩% ব্রয়লার পালনকারীর পর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। সমীক্ষাপর্ব সর্বশেষ লটে

একজন পালনকারীনী গড়ে ৩১১টি ব্রয়লার মুরগী পালন করছিল যার শতকরা ৯৭ ভাগ ব্র্যাক সরবরাহকৃত। একজন কৃষক সমীক্ষাপর্ব সর্বশেষ লট থেকে গড়ে ৩,৭৯৫ টাকা মুনাফা অর্জন করেছিল, ব্র্যাক পর্ব মুনাফার তুলনায় যার পরিমাণ ২,৬৬৭ টাকা বেশি। প্রায় ৯৮% চাষীর মতে মুনাফার পরিমাণ আশাতীত নয়। এর কারণ হিসেবে তারা উলেখ করেছেন মুরগীর অধিক মৃত্যু হার, স্বল্প বাজার মল্য, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং মুরগীর পরিচর্যার ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞানের অভাব। প্রায় ৮১% চাষীর মতে ব্রয়লার মুরগী চাষ পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অর্জিত মুনাফা পরবর্তী ব্রয়লার মুরগী পালন, সংসারের বিভিন্ন খরচ, গৃহ নির্মাণ, জমি কেনা, চাষী মহিলাদের কিছু নিজস্ব প্রয়োজন এবং ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্র্যাক এই কর্মসচির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ ছাড়া অন্য যে সব সেবা প্রদান করে থাকে সেগুলো হলো ব্রয়লার মুরগী পালন প্রশিক্ষণ, একদিনের দ্রুতবর্ধনশীল মুরগীর বাচ্চা, খাদ্য, টিকা, অন্যান্য আনুসঙ্গিক উপাদান সরবরাহ এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত তত্ত্বাবধান। ব্র্যাকের উপরোলিখিত সেবাদানের জন্য গড়ে প্রতি লটে (অর্থাৎ ১.৫-২ মাসের) ৪২৬.৭৫ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে ব্র্যাক প্রত্যেক চাষীর কাছ থেকে গড়ে ৪৫১.৫০ টাকা আদায় করে। অর্থাৎ ব্রয়লার কর্মসচি পরিচালনা করা ব্র্যাকের জন্য লাভজনক।

ব্র্যাকের দর্জিকাজ কর্মসচি শুর হয় ১৯৯৭ সালে। সেইসব মহিলাদের এই কর্মসচির জন্য নির্বাচন করা হয়, যাদের বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে, দর্জিকাজ সম্বন্ধে কোন না কোন ধারনা আছে, কর্মঠ, স্পষ্টভাষী, যার ব্যবসায়ী মনোভাব প্রখর, যে কুসংস্কারমুক্ত এবং যার পোষ্য সংখ্যা কম। সমীক্ষাটি মলতঃ গোপালগঞ্জ এবং খুলনা জেলায় যেখানে কর্মসচিটি ব্র্যাক প্রথম শুর করে সেখানে পরিচালনা করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে ৯১% মহিলা এই কর্মসচিতে অন্তর্ভুক্তির আগে অন্য কোন আয়মলক কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলনা, কিন্তু বর্তমানে প্রায় সবাই দর্জি কাজকে তাদের প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। গড়ে একজন মহিলা সপ্তাহে ৪৫ ঘন্টা এই কাজে ব্যয় করে এবং মাসে গড়ে ৬৬৩ টাকা আয় করে। দর্জি কাজের আয় কম-বেশি হওয়ার সাথে যে সব বিষয় সম্পৃক্ত সেগুলো হলো কর্মসচিতে সম্পৃক্ত সময়ের পরিমাণ, ব্র্যাক থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ, সংসারে বাড়তি লোকের অবস্থান, মহিলা দর্জির বয়স, তার কর্মদক্ষতা এবং খরিদ্দারকে আকর্ষণ করার মত কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলী।

কর্মসূচি পরিচালনায় ব্র্যাকের সদস্যপ্রতি মাসে গড়ে ৪০.৮৭ টাকা খরচ হয় এবং ব্র্যাক প্রতি সদস্যের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের জন্য মাসে ১০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করে। যেহেতু কর্মসূচিটি ব্র্যাকের জন্য নতুন এবং এর বিস্তার সীমিত তাই আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে যখন এই কর্মসূচিটি ব্র্যাকের সব এলাকায় সম্প্রসারণ করা হবে, তখন ব্র্যাকের খরচের টাকাটা পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব হবে।

সরকার ও এনজিওর সম্পর্ক: ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা*

সালেহউদ্দীন আহমেদ ও মোহাম্মদ রাফি

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই এদেশ প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা কবলিত। ফলে আমরা আমাদের দেশের ইতিবাচক অর্জনগুলো ভুলতে বসেছি। কিন্তু তারপরেও আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এছাড়া অন্যান্য অর্জিত বিষয়গুলোর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড, সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসচি, টিকাদান কর্মসচিতে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা, গার্মেন্টস শিল্প এবং অধিক পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপাদন অন্যতম। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ঐ সমস্ত সাফল্য বয়ে আনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত সংস্থাগুলো মহিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে এবং সাথে সাথে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীও এই অর্জিত সাফল্যের অংশীদার।

দরিদ্র জনসাধারণ এবং আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী ছাড়াও এই সাফল্যের পিছনে এনজিওদের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। তাদের এই অবদান ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ায় সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক নতুন রূপ লাভ করেছে। এই পরিবর্তনশীল সম্পর্ককে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। সত্তরের দশক সরকার ও এনজিওর সহ অবস্থানের সময়, আশির দশক সম্পর্কের মের করণের সময় এবং নব্বইয়ের দশক সম্পর্কের পুনঃস্থাপনের সময় বলে মনে করা হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তখন গ্রামের সংখ্যা ও গ্রামবাসীর সংখ্যার ভিত্তিতে এনজিওগুলো ছিল ছোট আকৃতির। সত্তর এবং আশির দশকের পর্বে এই সমস্ত ছোট এনজিওগুলোর দেশের উন্নয়নে ভূমিকা ছিল লক্ষ্যণীয়। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এই এনজিওগুলো দাতা

*'GO-NGO relations: the BRAC experience' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. আব্দুল আলীম।

গোষ্ঠীর সহায়তায় তাদের কার্যক্রম ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং পলী উন্নয়নে অনেক নতুন কর্মসচি সংযোজন করে।

কিন্তু এনজিওগুলোর সাফল্যে সরকারি কিছু প্রতিষ্ঠান বেশ নাখোশ হয়। এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, সরকারি কর্মচারীরা এই সংস্থাগুলোকে বিদেশী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যে হস্ক্ষেপ বলে মনে করে।

চলতি দশকের শুরতে এনজিওগুলোর ব্যাপক প্রসারতা সত্ত্বেও এরা বাংলাদেশের মাত্র ১০-২০% ভূমিহীন মানুষের কাছে সেবা পৌছাতে সক্ষম হয়। গত দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে এ উপলব্ধি জন্মায় যে পাশাপাশি কাজ করা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে পারস্1রিক সম্1র্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অতি জররী বলে মনে করা হয়।

- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলো গুরত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সরকার ও এনজিওর মধ্যে পারস্1রিক সহযোগিতা যত বেশি হবে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ তত বাড়বে।
- কর্মসচির পরিকল্পনা, মনিটরিং, মল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিওর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি ও নিবিড় যা কর্মসচি খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
- সরকার ও এনজিওর সহযোগিতা একদিকে যেমন একটি নিয়ম তৈরীর মাধ্যমে পরিপর্ণভাবে কাজ করতে পারে অন্যদিকে উভয়ের মধ্যে পারস্1রিক সাহায্য, সহযোগিতা এবং পরিপরকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

সময়ের সাথে সাথে দরিদ্র জনসাধারণের নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে এনজিওর সাফল্য সরকার স্বীকার করতে শুর করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের (১৯৯৬) মতে সরকার ও এনজিওর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তিন ধরনের ব্যবস্থাপনা দরকার। যেমন,

- প্রতিযোগিতামলক আহ্বানের ভিত্তিতে সরকার ও এনজিওরা চুক্তি করতে পারে।
- প্রকল্প বাস্বায়নে অর্থাৎ যৌথ অর্থায়নে এনজিওরা সরকারের সাথে অংশীদারিত্বমলক ব্যবস্থাপনা তৈরী করতে পারে।

- এনজিওর প্রকল্প চালু রাখার ক্ষেত্রে সরকার অথবা সরকারি ব্যাংকের অর্থ সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে।

সরকার ও এনজিওর অংশীদারিত্বমূলক কর্মক্ষেত্রের বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, নারী ও শিশু, পশুসম্পদ, মৎস, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য।

যদিও দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওর লক্ষ্য অভিন্ন তবুও তাদের মধ্যে বিষয়গুলো উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতা প্রায়শই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য করা যায়।

নিম্নবর্ণিত উপাদানগুলো সরকার এবং এনজিওর কাজের পথকে সুগম করে

- সরকার তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য সামর্থ্যের ভিত্তিতে কর ধার্য্য করে রাজস্ব আদায় করতে পারে। কিন্তু এনজিওর সম্পদ বা তাদের সামর্থ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল।
- সরকারি প্রশাসন সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং তা কম নমণীয়। অন্যদিকে এনজিওতে ব্যবস্থাপনা এবং এর পরিচালনা পদ্ধতিতে কোন জটিলতা নেই বলে মনে করা হয়।
- সরকার তার নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু এনজিওরা তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সফলতার জন্য স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীর উদ্বুদ্ধকরণের উপর নির্ভর করে।

ব্র্যাক সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সহযোগিতামূলক কাজ করে অনেক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে যা নিম্মোক্ত উপাদান সমূহকে প্রভাবিত করে।

- সরকার ও এনজিওর গৃহিত সহযোগিতামূলক উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের লক্ষ্য পূরণে সমর্থ্য হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে এই সম্পর্ক জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
- এনজিওরা সরকারের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। এনজিওরা উন্নয়নমূলক

কর্মকাণ্ড বাস্বায়নে শুধু সম্1রকই নয়, এর পরিপর্ণতা প্রদানেও সহায়তা করে।

- এনজিওরা দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে সেবা দিতে পেরেছে, কাজেই তাদের ভূমিকা জনসমক্ষে তুলে ধরা উচিত। যেখানে সরকার কোন কর্মসচি নিতে সক্ষম নয় সেখানে এনজিওরা সক্ষম।
- বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে এনজিওর কর্মকাণ্ডকে সরকার স্বীকৃতি দিতে চায় না এবং সব সময় এনজিওকে অধস্ন মনে করে। এ সম্1র্কের উন্নয়ন করা উচিত।
- অতীতের চেয়ে বর্তমানে সরকার এনজিওর কর্মকাণ্ডকে অধিক স্বীকৃতি দিেচ্ছ। কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে পারস্1রিক বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। এ ধরনের অবিশ্বাস আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দর করা যেতে পারে।
- সরকার এবং এনজিওর মধ্যে সম্1র্ক একটি আইনানুগ কাঠামোর মধ্যে হওয়া উচিত।
- সহযোগিতামলক উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় এনজিওগুলো তাদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে কর্মসচি তৈরী ও বাস্বায়নে স্বনিয়ন্নাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই ফলপ্রসু সহযোগিতার ক্ষেত্রে এ ধরনের স্বাধীনতা থাকা দরকার।

এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি জটিল কাঠামো ও আমলাতন্কে মোকাবিলা করার যথেষ্ঠ ধৈর্য্য থাকা প্রয়োজন। এনজিওর মাধ্যমে কর্মসচি বাস্বায়নের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে তাদের আচরণের নিম্নোক্ত বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করা গেছে।

- সাধারণতঃ সরকার এনজিওদের সহযোগিতা করতে প্রতিশ্র তিবদ্ধ নয়। এনজিওরা কখনও কখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের অঙ্গীকার পরণের উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করে। আবার সরকারও আন্র্জাতিক চাপের মুখে পরামর্শের ভিত্তিতে এনজিওদের সহযোগিতা করে থাকে।
- এনজিওরা সরকারের নিম্ন স্রে কোন কর্মসচি বাস্বায়ন করতে গেলে তাদের নিকট উিচ পর্যায়ের কর্মকর্তার নির্দেশ ছাড়া অনুমোদন পাওয়া যায় না, ফলে কাজ করা কঠিন হয়।
- সরকারি কর্মকর্তার সহযোগিতা পাবার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্রিক সম্1র্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে এনজিও কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কাজ করে থাকে।

- ব্র্যাক সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথেষ্ঠ জ্ঞানের অভাবই সহযোগিতা পাবার পথে অন্তরায়। যখন ব্র্যাক আইসিডিডিআর,বি-র মত সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ কর্মসচি করতে লাগল তখন সরকারি কর্মকর্তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা পেল।

সাম্প্রতিককালে সরকার ও এনজিওদের মধ্যে পর্বের তুলনায় অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সরকার ও এনজিওর সম্পর্কের এই পর্যালোচনা থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই চলমান সম্পর্ককে আরো অর্থবহ করা যেতে পারে।

ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসচি থেকে কেন কিছু সদস্য লাভবান হতে পারছে না?*

দিলর বা বানু

সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসচির মাধ্যমে ব্র্যাক দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সঞ্চয়, ঋণ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের আয়মলক কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে। ব্র্যাকের সদস্যদের উপর গবেষণা ও মল্যায়ন বিভাগ পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসচির প্রভাব সম্পর্কিত সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, কিছু সদস্য দীর্ঘকাল ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসচিতে অংশগ্রহণের পরও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এমনকি গত তিন বৎসরে তাদের সম্পদের পরিমাণও কমে গেছে। আলোচ্য গবেষণায় এমন দশজন মহিলার উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে যারা তিন বৎসরের অধিক সময় ব্র্যাকের সাথে জড়িত এবং অন্যান্য সদস্যদের সমান সুযোগ পাবার পরও অন্য সদস্যদের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। এই দশজন সদস্যের কেউই তাদের সংগঠনের জন্য কোন উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এরা সবাই সংগঠনের সাধারণ সদস্য। এ গবেষণাতে তাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, কিছু খানার ক্ষেত্রে তাদের জীবনপ্রবাহ জনিত কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। যেমন, খানার প্রধান উপার্জনকারীর বার্ধক্যজনিত কারণে কিছু খানায় নিয়মিত উপার্জন কমে গেছে। আবার ব্র্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তরণী মায়েরা শিশু লালন পালনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন আয়মলক কাজে জড়িত হতে পারেনি।

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা প্রধানতঃ নির্ধারিত দশটি খানার উন্নয়নে বাধা হয়ে দাড়ায়। খানাগুলোতে সর্বনিম্ন ৩৫০ থেকে ১৯,৬০০ টাকার সম্পদ আছে বলে জানা গেছে এবং খানাগুলোর সম্পদের গড় মল্য ৪,৭০৬ টাকা। আরও দেখা গেছে যে, নয়জন সদস্য তাদের নিজ

---

* 'Why some VO members do not benefit from RDP intervention: a panel study of ten selected cases' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

বাড়িতে বসবাস করে এবং বাকী একজন আত্মীয়ের জমিতে ঘর তুলে আছে। এদের কেউই ব্র্যাক থেকে ঘর তৈরীর জন্য কোন ঋণ গ্রহণ করেনি।

খানা প্রধানের স্বল্প আয়মলক কাজে অংশগ্রহণের ফলে খানাগুলোর উপার্জন অনিয়মিত হয়ে পড়ে যা কিনা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বড় বাধা। খানা প্রধানেরা মলতঃ ঋতুভিত্তিক কাজের সাথে জড়িত। ফলে বছরের সবসময় তাদের একই ধরনের উপার্জন থাকে না। নয়টি খানায় দেখা গেছে একাধিক উপার্জনক্ষম ব্যক্তি রয়েছে, তবে দ্বিতীয় উপার্জনকারী হলো একজন মহিলা। আটজন সদস্যকে দেখা গেছে খুবই স্বল্প মলধনের এবং স্বল্প আয়তনের কাজ করছে, ফলে তাদের আয়ও হ চ্ছ অনেক কম। নয়জন সদস্য ব্র্যাক থেকে ২,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ ঋণ নিয়েছে । তবে পারিবারিক সংকটের কারণে কেউই ঋণের টাকা আয়মলক কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। এর ফলে তারা তাদের নিজস্ব ঋণের টাকার উপর এবং ঋণের টাকা খাটানোর লাভের উপর নিয়ন্ণ রাখতে পারেনি। পাঁচজন সদস্য ব্র্যাক থেকে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তবে এরা কেউই স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজস্বভাবে নতুন কোন আয়মলক কাজ শুর করেনি।

ব্র্যাকের ঋণ কোন নতুন আয়মলক কাজ শুর করার জন্য যথেষ্ট নয় বলে কিছু সদস্য মত প্রকাশ করেছেন। দু'জন সদস্য ব্র্যাক ছাড়াও অন্য একটি সংগঠনের সদস্য হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে বলে জানিয়েছে। পারিবারিক সংকট তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা বলে সদস্যরা জানিয়েছে। গত তিন বৎসরে খানাগুলো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু এবং উৎপাদনের উপকরণসমহ যেমন গর , রিক্সা, ভ্যান, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি নষ্ট বা চুরি হওয়া সহ বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যা কিনা খানাগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও নীচে নামিয়ে দেয়। খানাগুলো এধরনের দুর্যোগে সম্দ বিক্রির মাধ্যমে পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পরণ করেছে বলে জানিয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হওয়া সত্ত্বেও এরা ব্র্যাক ছেড়ে যা চ্ছ না কারণ ব্র্যাক থেকে তারা প্রয়োজনে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। খানার জন্য ঋণ সংগ্রহ করছে বলে পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় বলে এই দশজন সদস্য জানিয়েছে। এছাড়া তারাও স্বল্পমল্যের কিছু নিজস্ব সম্দ তৈরী করতে পেরেছে। পরিবারের কোন গুর ত্বপর্ণ সিদ্ধান্ গ্রহণের পর্বে তাদের মতামতকে সবাই প্রাধান্য দেয় বলে সদস্যরা জানিয়েছে। সামাজিক সমস্যা এবং বিষয়সমহে

সদস্যদের সচেতনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন না হওয়ার ফলে সামাজিক অবস্থার উন্নয়নও তেমন ঘটেনি। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ব্র্যাকের সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম এই দশজন সদস্যকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এদের মধ্যে ছয়জন সদস্য খানার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আয়মলক কাজে লাগিয়ে নিয়মিত নির্দিষ্ট আয়ের চেষ্টা করছে এবং তিনজন সদস্য ব্র্যাকের সাথে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে সদস্যপদ বাতিল করার পরিকল্পনা করছে।

কাজেই সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যে সব সদস্যের দৈহিক অথবা অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতার অভাব রয়েছে তাদের জন্য ব্র্যাক কোন বিশেষ কর্মসচি গ্রহণ করতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারছে না এমন সদস্যদের ঋণের ব্যবহারকে ব্র্যাক প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং এ ধরনের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনে ব্র্যাক থেকে সঞ্চয় উত্তোলনের সুযোগ থাকলে ভাল হয়। এছাড়াও পারিবারিক সংকট ও ঋতু বৈচিত্রের জন্য এ ধরনের সদস্যদের কোন জর রী ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকলে ব্র্যাক তার সদস্যদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে রোধ করতে পারবে।

ব্র্যাক সদস্যদের জীবনে পরিবর্তন: একটি জেন্ডার প্রেক্ষিত*

আমিনা মাহবুব

বাংলাদেশে মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদা সাধারণতঃ পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এনজিওরা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে সমকালীন গবেষণাগুলোতে দেখা যায় যে, ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলো মহিলাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে যা বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করে। কিন্তু জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে মহিলাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তনের বিষয়টি গবেষণাগুলোতে অনুপস্থিত। এই জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাগুলোও মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা পরিশীলিত ও পরিচালিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্র্যাক গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের গৃহে জেন্ডার সাম্য সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ ও প্রত্যাশার পরিবর্তন যাচাইয়ের জন্য একটি গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ নেয়।

বর্তমান গবেষণাটি মতলব এলাকার তিনটি গ্রামে ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়। এর মধ্যে দু'টি গ্রামে ব্র্যাকের কর্মসূচি ছিল, অন্য গ্রামটিতে ব্র্যাক বা অন্য কোন এনজিওর কর্মসূচি ছিল না। এই তিনটি গ্রাম থেকে একই আর্থ-সামাজিক অবস্থার ১৮ জন মহিলাকে কেস্ স্টাডির জন্য নির্বাচন করা হয়। তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে ছিল কেস্ স্টাডির জন্য জীবন বৃত্তান্ত, মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনা।

গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, কতিপয় ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শগত দিক দিয়ে ব্র্যাক গ্রাম সংগঠনের সদস্য ও অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিরাজমান। এই পার্থক্যগুলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, আবার কিছু বা তাদের আচরণ ও অনুশীলনে প্রতিফলিত

---

*'Exploring changes in the lives of BRAC women: a gender perspective' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

হতে দেখা গেছে। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে প্রতীয়মান হয় যে তারা একটি পরিবর্তনশীল সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একারণেই দেখা গেছে যে, যদিও জেন্ডার সাম্য সম্পর্কিত সচেতনতা তাদের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা ও সামাজিক কারণে এটা তাদের অনুশীলনে আসতে পারছে না।

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের মহিলাদের কাছে পর্দা সম্পর্কিত প্রত্যয় এখন একটি বিমর্ত রূপ লাভ করেছে। তারা এক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোভাব ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উচ্চতর প্রত্যয়কে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া তারা মনে করে যে পর্দা ব্যবস্থা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। গৃহে ক্ষমতা অনুশীলনে দেখা গেছে যে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখন আর পুরুষের একচেটিয়া বিষয় নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের মহিলাদের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কিত সচেতনতা তাদের ক্ষমতার সাম্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে ব্র্যাক সদস্যরা অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় সমাজে অনেক বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে।

গৃহের ভিতরে ও বাইরে বহুমুখী কাজে সম্পৃক্ততার কারণে ব্র্যাক সদস্যদের মধ্যে জেন্ডার শ্রম বিভাজন সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনাতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্র্যাক সদস্যরা মনে করে তাদের স্বামীদেরও সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করা উচিত। তাহলে তাদের কাজের চাপ হ্রাস পাবে।

গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্র্যাক সদস্যদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে সন্তান এর প্রতি প্রত্যাশার ক্ষেত্রেও একটি পরিবর্তন এসেছে। কোন কোন সদস্য এখন তাদের মেয়ে সন্তানদের পড়ালেখায় বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় প্রধান ভূমিকা রাখে, যেমন নারী শিক্ষায় সরকারি উদ্যোগ ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে মহিলাদের চাকুরীর সুযোগ। তবে উক্ত পরিবর্তনগুলো সমাজের অন্যান্য মহিলাদের চিন্তা ভাবনা ও প্রত্যাশায় খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেনি।

গবেষণায় দেখা যায়, ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসচিতে সম্পৃক্ততা মহিলাদের জেন্ডার সাম্য সম্পর্কিত চিন্তা চেতনা ও মতাদর্শকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনের গতিধারা বিশেষণে তিনটি প্রধান বিষয় চিহ্নিত করা যায় যথা, অর্থ (সঞ্চয় ও ঋণ), জ্ঞান ও দক্ষতা এবং গতিশীলতা।

ব্র্যাক সদস্যদের জেন্ডার সাম্য সম্পর্কিত বিশেষণে দেখা যায় যে, ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলো পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে একটি সহায়ক ভূমিকা রাখে।

নির্যাস ৬৪

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের সংস্থাপন: তৃণমূলের জন্য একটি মড্যুল*

হাশিমা-ই-নাসরীন, ক্যাথী ক্যাশ, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, আব্বাস ভূইয়া ও সৈয়দ মাসুদ আহমদ

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদেশে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মানুষ অপুষ্টি ও জরাজীর্ণতায় ভুগছে এবং সেই সাথে রয়েছে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা ও দুর্গমতা। যদিও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এইডস রোগের ব্যাপকতা কম তবুও প্রতিনিয়ত হাজার হাজার লোক কাজের তাড়নায় মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশে যাওয়া আসা করায় এইডস এর বিস্তার লাভের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাছাড়াও রয়েছে সমকামীতার মত ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য কিছু আচরণ।

একথা নতুন নয় যে, যৌনরোগ ও এইডস পরস্পরকে ছড়াতে সাহায্য করে। কিছু ঘটনা অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে অনেক মহিলা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বা যৌনরোগে ভুগছে। চিকিৎসা না করলে এই রোগগুলো মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলারা লজ্জা বা কলঙ্কের ভয়ে এ রোগগুলো নিয়ে ডাক্তারের নিকট যান না বা এই রোগগুলোর চিকিৎসা করান না। এছাড়াও সাধারণ জনগণ বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণকে প্রজননতন্ত্রের রোগ বা যৌনরোগ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য খুব কম উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ১৯৯৭ সালে মতলবে প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্যের উপরে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করা হয়, যেখানে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি যৌথ উদ্যোগে ও পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করে আসছে। মতলবে আইসিডিডিআর,বি মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যের উপরে ১৯৬৬ সাল থেকে কাজ করে আসছে এবং ব্র্যাক ১৯৯২ সাল থেকে ঋণ কর্মসূচি ও

---

*'Reproductive and sexual health promotion in a sensitive socio-cultural environment: developing a module for the grassroots' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (এপ্রিল ২০০০)। সার-সংক্ষেপ করেছেন হাশিমা-ই-নাসরীন।

সামাজিক সচেতনতার উপরে কাজ শুরু করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কিভাবে দরিদ্রদের স্বাস্থ্য ও জীবনের উপর প্রভাব ফেলে সেটি দেখার জন্য উল্লেখিত দু'টি সংগঠন ১৯৯২ সাল থেকে একসাথে কাজ শুরু করে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে কিশোর-কিশোরী এবং নারী-পুরুষের মধ্যে যে সমস্ত ঝুঁকিপর্ণ ও অরক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটে তা উপলব্ধি ও অনুসন্ধান করা। তাছাড়া এর উপর ভিত্তি করে একটি উপযুক্ত কার্যক্রম তৈরী করা যার মাধ্যমে নারী-পুরুষ তথা কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও পারিবারিক জীবন এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হবে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপর্ণ ও অরক্ষিত ঘটনাগুলি কী তা সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করার জন্য মতলবে একটি জরিপ চালানো হয়। এ উপলক্ষে বিবাহিত ২০ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা, এবং অবিবাহিত ১৩ জন কিশোর ও ১২ জন কিশোরীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এছাড়াও ৫০ জন পুরুষ-মহিলা এবং ২০ জন কিশোর-কিশোরীর সাথে আলাদাভাবে ৮টি দলীয় আলোচনা করা হয়। যে বিষয়গুলোর উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলো হল, মানুষ কখন ও কিভাবে যৌন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, বিয়ের আগে ও পরে যৌন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা এবং অভিব্যক্তিগুলো কিভাবে একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করে। তাছাড়া পারিবারিক নির্যাতন, প্রজননতন্ত্রের রোগ, যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের জ্ঞান সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিষয়টির সংবেদনশীলতার কথা চিন্তা করে গ্রামে কোন কোন মানুষের এসব বিষয়ে কথা বলার ও মানুষকে সচেতন করার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং কোন্ সামগ্রীগুলোকে এ ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে গবেষকরা তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। দেখা গেছে গ্রামীণ সমাজে এ বিষয়গুলোর উপর কাজ করার উপযুক্ত দক্ষতা গ্রামের দাই, স্বাস্থ্য সেবিকা (ব্র্যাকের মাঠকর্মী), গ্রাম্যচিকিৎসক এবং কবিরাজদেরই আছে। তাছাড়া ব্র্যাকের গ্রাম সংঠনের সদস্য, ভাবী ও দাদীরাও পারেন এসব বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে।

বিশেষণের পর গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন গল্পে ও তথ্যে রূপান্তরিত করে ছবির মাধ্যমে পাঁচ খণ্ড ফ্লিপচার্টে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকটি গল্পই শেষ হয় একটি প্রস্তাবিত সমস্যা সমাধানের উপায়ের মাধ্যমে। গল্পগুলো গ্রামবাসীদের জীবনের ও সমাজের চিত্রকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে যা তাদেরকে প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্যের এই কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে সাহায্য করতে পারে। সর্বমোট ৬৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী

এবং ১,৮৯০ জন সাধারণ মানুষ এ বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ পায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিলেন যারা গ্রাম সংগঠন ও উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের সভায় অংশগ্রহণ করেন, ভাবী এবং যুব সমাজের কিছু প্রতিনিধি। কর্মসচি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীকে একসেট করে ফ্লিপচার্ট দিয়ে দেয়া হয়।

কর্মসচির ফলপ্রসতা জানার জন্য একটি মল্যায়ন করা হয়। মল্যায়নের সময় কার্যক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট কিভাবে ব্যবহার করা হয়, ব্যবহার করতে গিয়ে কী কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং কিভাবেইবা সেগুলো আয়ত্তে আনা হয় সে সম্পর্কে তথ্য নেয়া হয়। তাছাড়া কর্মসচিটি তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং কর্মজীবনে কোন প্রভাব ফেলছে কিনা সে সম্পর্কেও মল্যায়নে আলোকপাত করা হয়।

কর্মসচিটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার বেশিরভাগই বিষয়টির সংবেদনশীলতাকে ঘিরে। যেমন, একই সমাজে বসবাস করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহই ছিল একটি বড় সমস্যা। অন্যদিকে গ্রাম্যচিকিৎসক এবং কবিরাজরা এ কর্মসচিতে তাদের সময় ব্যয়ের জন্য বার বার ক্ষতিপরণের কথা জানতে চান। কর্মসচির কর্মীবৃন্দ অবশেষে তাদেরকে এই বলে প্রণোদিত করতে সক্ষম হয়েছিল যে, প্রশিক্ষণ পেলে যৌন ও প্রজননতন্ত্রের রোগ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে যা তাদেরকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করবে এবং তাদের ব্যবসার পরিসর বাড়াবে।

প্রারম্ভিক গবেষণায় দেখা যায় যে, যৌন ও প্রজননতন্ত্রের রোগ, এইডস, প্রজননতন্ত্র ও যৌন বিষয়ক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারিবারিক নির্যাতন ও যৌনস্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক, যৌনস্বাস্থ্যে স্বামী-স্ত্রী তথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্কের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, এমনকি সকল শ্রেণীর স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যেও রয়েছে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব। উপরন্তু এলাকাবাসীদের মধ্যে রয়েছে যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব, পারিবারিক নির্যাতন, ধর্ষণ, জোরপর্বক যৌনমিলন এবং বিয়ের আগে ও পরে ঝুঁকিপর্ণ যৌন আচরন যা গ্রামবাসীদের যৌনস্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

মল্যায়নে দেখা গেছে, গ্রাম্যচিকিৎসক, স্বাস্থ্যসেবিকা ও দাই সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীরই যৌন ও প্রজননতন্ত্রের রোগ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। কিভাবে কনডম ব্যবহার করতে হয় এবং

জন্মনিয়ন্ত্রণে ও যৌনরোগ প্রতিরোধে কনডমের গুরুত্ব সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এখন জানেন পারিবারিক অশান্তি ও ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। দাইরা এখন এ ধরনের কোন রোগী দেখলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন চিকিৎসকের কাছে যেয়ে চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দেন ও কনডম ব্যবহারের কথা বলেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবিকারা সঙ্গী চিকিৎসার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণ পাবার পর কবিরাজরা মহিলা ও কিশোরীদের যৌনরোগ ও মাসিকের সময় কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। এছাড়াও তারা যৌনরোগীদের কনডম ব্যবহার ও সঙ্গী-চিকিৎসার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ ঔষধের দোকান থেকে কনডম কিনে এনে যৌনরোগীদের মধ্যে বিক্রিও করেছেন। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের বেশিরভাগ সদস্য মনে করেন যৌনরোগ প্রতিরোধ করার জন্য মানুষের উচিৎ বহুগামীতা পরিহার করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, কনডম ব্যবহার করা, এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের একজন সদস্য বলেছেন চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে একজন যৌনরোগী তার সঙ্গীর সাথে যৌনমিলন করতে পারেন বটে তবে তাকে অবশ্যই কনডম ব্যবহার করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা ফ্লিপচার্টগুলোকে তাদের কার্যক্ষেত্রে কতটুকু সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা প্রত্যেকেই খুব ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। একজন দাই বলেছেন, "যদিও আমি সরাসরি এই ফ্লিপচার্ট থেকে উপকৃত হইনি, তবুও কিশোর-কিশোরীদেরকে এবিষয়ে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আমি নিজেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম এবং আমি তাদের মধ্যে এর একটা ইতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করেছি"। বেশিরভাগ দাই ও কবিরাজ বলেছেন, বিবাহিত মহিলারা খুব উৎসাহ নিয়ে বইগুলি দেখতে চান। মাঝে মাঝে তারা দাই বা কবিরাজের কাছ থেকে ফ্লিপচার্টগুলোকে ধার করে বাড়ীতে নিয়ে যান নিজেদের মধ্যে, বিশেষ করে স্বামীর সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। উল্লেখ্য যে, স্বামীদের কাছ থেকে কর্মসূচি সম্পর্কে তেমন কোন বাধা আসেনি। স্বাস্থ্যসেবিকাদের মতে, ফ্লিপচার্টের যে গল্পটিতে পারিবারিক নির্যাতনের সাথে যৌনরোগের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, সেই গল্পটি গ্রামের মানুষদের মনে বেশ নাড়া দিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবিকারা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এবিষয়ে তথ্য প্রচারের জন্য আলাদাভাবে বিশেষ কিছু ফোরামের আয়োজন করে এবং ফোরামের স্থানগুলো ছিল ব্র্যাক স্কুল। এছাড়াও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেও তথ্য প্রচার করা হয়। স্বাস্থ্যসেবিকাদের একজন বলেন "যখন গ্রামের মেয়েরা গর্ভপাত

করানোর জন্য আমার কাছে আসে তখন আমি তাদেরকে খুব ভালো করে যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করি ও কনডম ব্যবহারের কথা বলি। আমি এই উপদেশগুলো দেই ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে। তাদের বলি, যদি তোমরা এগুলো মেনে চল তাহলে আর এ ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে না"। বেশিরভাগ স্বাস্থ্যকর্মীই মনে করেন কর্মসচির একটি ইতিবাচক প্রভাব তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আছে। তবে স্বাস্থ্যকর্মীরা সবাই স্বীকার করেছেন যে, বইগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে প্রারম্ভিকভাবে তাদের কিছু সমস্যা হলেও শেষপর্যন্ত তারা তা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রামের মানুষেরাও এখন জানেন যৌনবিষয়ক কোন সমস্যায় পড়লে সাহায্যের জন্য কোথায় ও কার কাছে যেতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের কেউ কেউ মনে করেন কর্মসচিটি প্রসারিত করা উচিত এবং তারা এর স্বপক্ষে কাজ করারও ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের মত রক্ষণশীল সমাজে এ ধরনের একটি সংবেদনশীল কর্মসচির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে যা উপযুক্ত কৌশলের মাধ্যমে কোনরকম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছাড়াই গ্রাম বাংলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ কর্মসচিটি শুধুমাত্র প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানই বাড়ায়নি বরং এটি মানুষের ব্যবহারিক পরিবর্তন ও সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়তা করে। তাছাড়া গ্রামের সাধারণ মহিলারা তাদের স্বামী ও বাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঝুঁকিপর্ণ চালচলন সম্পর্কে কথা বলার সময় ফ্লিপচার্টগুলোকে সামাজিক স্বীকৃতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তবে কর্মসচিটির সম্প্রসারণ ও স্থায়ীত্বের জন্য গ্রামের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি যেমন, স্কুল শিক্ষক, মাতব্বর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মসজিদের ইমাম এবং গ্রামের যুব সমাজকে কর্মসচির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা কর্মসচির স্বপক্ষে কথা বলেন।

গ্রামের মহিলাদের প্রসবসংক্রান্ত বিষয়ে একটি সমীক্ষা*

কাওসার আফসানা ও সাবিনা এফ রশীদ

বিশ্বব্যাপী গত তিন বা চারদশক ধরে প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা ও বাক-বিতণ্ডা চলছে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে কায়রো ও বেজিং সমাবেশের পর বিষয়টির উপর আরও জোর দেয়া হয়। তবুও বাংলাদেশে মাতৃত্বজনিত স্বাস্থ্যের চিত্র অত্যন্ত করুণ। এখনও প্রতিবছর প্রতি এক লক্ষ জীবিত সন্তান প্রসব করতে গিয়ে ৪৭০ থেকে ৭৭০ জন মায়ের মৃত্যু ঘটে। মায়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যেমন, প্রসবপর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, হাসপাতালে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মায়ের মৃত্যুর হার কমে। অথচ এখনও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৯২-৯৫ ভাগ প্রসব বাসায় হয়। এমনকি প্রসবজনিত কারণে মায়ের অবস্থার মারাত্মক অবণতি হলেও কেউ হাসপাতালে যেতে চায় না।

মহিলারা যাতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে এজন্য বেজিং সমাবেশ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোকে জেন্ডার সংবেদশীল করার জন্য জোর প্রস্তাব রাখে। এখানে জেন্ডার সংবেদনশীল বলতে বুঝানো হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো আসলেই মহিলাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পরণ করে কিনা। এর আলোকে ব্র্যাকের সুস্বাস্থ্যগুলো মহিলাদের প্রতি কতটুকু সংবেদনশীল এটা উদঘাটন করাই এই গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়।

সুস্বাস্থ্যে প্রসবের জন্য খুব কম মহিলাই আসে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৯২% মহিলার প্রসব বাসায় হয়, ৭% সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে ও একভাগ হয় সুস্বাস্থ্যে। জনগনের সাথে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে কাজ করার পরও এ ধরনের ফলাফল অপ্রত্যাশিত। সুস্বাস্থ্যগুলো গ্রামের মহিলাদের প্রসবের সময়

---

*"Discoursing birthing care: experiences from BRAC Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাওসার আফসানা।

কতটুকু প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পরণ করতে পারছে এ প্রশ্ন সামনে রেখে আলোচ্য গবেষণাটি করা হয়।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্র্যাকের প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসচির ২১টি সুস্বাস্থ্যের মধ্যে একটি সুস্বাস্থ্য নির্বাচন করা হয়। এর কারণ হল, এ সুস্বাস্থ্যটি ১৯৯২ সাল থেকে মাতৃ অপেক্ষাকেন্দ্র (maternity waiting home) হিসাবে চালু আছে। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রাম থেকে এর দরত্বও তেমন বেশি নয়। এই গবেষণায় ২০ জন (২০-৪০ বৎসর) মহিলা ও ছয়জন গ্রাম্য দাই-এর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ছয়জন মহিলা সুস্বাস্থ্যে প্রসবজনিত সমস্যা নিয়ে ভর্তি হলে তাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়। গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে তিনটি ফোকাস গ্রপ আলোচনা এবং সুস্বাস্থ্যের ডাক্তার এবং মহিলা প্যারামেডিকদের সঙ্গে আলাদাভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনটি বিষয় পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তা হল প্রসব সম্বন্ধে মহিলাদের ধারণা, সুস্বাস্থ্যের গুণগতমান এবং প্রসবের সময় প্রসতি মায়ের ভূমিকা।

প্রসবকে মহিলারা একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করে এবং এর জন্য হাসপাতালে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বলেই তাদের ধারনা। হাসপাতাল একটি ভয়ংকর জায়গা, হাসপাতালে গেলেই অপারেশন করে দেবে এধরনের নানারকম ধারণা মহিলাদের মনে ভীতির সৃষ্টি করে। প্রসবজনিত সমস্যাকে মহিলারা অনেকসময় ‘বাও বাতাস’ ও ভূতপ্রেতের সঙ্গে জড়িত করে অপচিকিৎসা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে আধুনিক চিকিৎসা যদি প্রসবজনিত সমস্যা দর করতে না পারে, তাহলে এই বাও বাতাস দরীকরণের চিকিৎসার উপর মহিলাদের আস্থা আরও জোরদার হবে। হাসপাতালে যেতে লজ্জা এবং পর্দা অনেকক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু প্রসবকালীন সমস্যা হলে এ বিষয়গুলো তেমন গুরত্ব পায় না।

গুণগতমান যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায় যে, গ্রামের মহিলারা যে কারণে হাসপাতালে যায় সে ব্যবস্থা সুস্বাস্থ্যে নেই। প্রসবকালীন অসুবিধা হলে রক্তের ব্যবস্থা, সিজারিয়ান বিভাগের সুবিধা, এমনকি গর্ভফুল আটকে গেলে তা বের করারও ব্যবস্থা নেই। এসব সমস্যা নিয়ে যখন গ্রামের মহিলারা সুস্বাস্থ্যে আসে তখন তাদের সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সরকারি হাসপাতালের গুণগতমান নিয়ে এমনিতেই তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, সেক্ষেত্রে তাদেরকে আবার সুস্বাস্থ্য থেকে সেখানে পাঠানো হলে গ্রামের মহিলারা মনে করে ব্র্যাক তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।

তার শরীরে কি করা হচ্ছে বা কি অসুবিধা হয়েছে তা জানার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে। সুস্বাস্থ্যের স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা এ বিষয়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না। রোগীকে পরীক্ষা করার সময় তাকে বলে নেয় না কি করা হবে বা কি করা হয়েছে। রক্তচাপ কেমন, প্রসব হতে কতটা সময় লাগতে পারে বা বাচ্চা কি রকম আছে - এগুলো রোগীকে কখনই বলা হয় না। রোগীও গ্রামের গরীব মানুষ, তাই সাহস করে জিজ্ঞেস করে না।

গুনগতমানের আরেকটি দিক হল মানবিক দিক। এ বিষয়ে অলোকপাত করা হয়েছে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর, যেমন গোপনীয়তা, মর্যাদা, যত্নশীলতা এবং মানসিক সহায়তা। গোপনীয়তার ধরন পুরোপুরি নির্ভর করে সংস্কৃতির উপর। গ্রামদেশে বাচ্চা প্রসব করানো হয় নিম্নাঙ্গ ঢেকে কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা প্রথার অনুসারী সুস্বাস্থ্যে তা হয় মোটামুটি খোলামেলা ভাবে। তবে মর্যাদা এবং যত্ন নেয়ার ব্যাপারে তারা ব্র্যাকের প্যারামেডিকদের প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মহিলাদের সাথে ব্র্যাকের প্যারামেডিকরা অনেক সময় অপমানজনক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে যা হয়তো তারা স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে ধরে নেয়। অন্যদিকে গ্রামের গরীব মহিলারা স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশাও করে না । প্রসবের সময় দেখা যায়, মহিলা হিসেবে ব্র্যাকের প্যারামেডিকরা প্রসতি মাকে মানসিক সহায়তা দিয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে তারা প্রসতিমায়ের পরিবারের দু'একজন সদস্যাকে প্রসবকক্ষে থাকতে দেয়।

সুস্বাস্থ্যে প্রসব যদিও মহিলা প্যারামেডিকরা করে কিন্তু গ্রামের মহিলারা প্রসবের সময় পুরুষ স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর উপস্থিতিকে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। প্রসবের সময় পুরুষের উপস্থিতি তাদের হাসপাতালে যাওযার ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এটা শুধু যে লজ্জা তা নয়, এতে পাপ হবে বলেও তাদের ধারনা। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রসতিমায়ের অবস্থা সংকটজনক হলে তখন পুরুষ ডাক্তারের উপস্থিতি তারা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে।

বাসার বাইরে প্রসব অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। পক্ষান্তরে বাসায় প্রসব হলে তার খরচ একেবারেই কম। সুস্বাস্থ্যে খরচ তেমন না হলেও গ্রামের গরীব মানুষের জন্যে তা বহন করাও অত্যন্ত কষ্টকর। তাদের মতে প্রসব হল একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা, এজন্য অর্থ খরচ করা একটি বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থ খরচ ছাড়া

যাতায়াতও একটি গুরত্বপর্ণ বিষয় যা মহিলাদের সুস্বাস্থ্যে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রসব যখন বাসায় হয় তখন কোন্ ধাত্রী আসবে, কোথায় প্রসব হবে ইত্যাদি বিষয় বাড়ির মহিলারা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যে মুহুর্তে প্রসব সুস্বাস্থ্য বা কোন হাসপাতালে হয়, তখন পুরষের ভূমিকা বড় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এখানে খরচের ব্যাপার আছে। বাসায় প্রসব হলে এর খরচ নির্ভর করে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। এছাড়া ধাত্রীর সঙ্গে প্রসতিমায়ের চিন্তাধারায় একাত্মতা ও সামাজিক মর্যাদা সমান থাকাতে প্রসবের সময় একে অন্যেকে সহযোগিতা করে থাকে। অন্যদিকে হাসপাতাল বা সুস্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা প্রসব নিয়ন্ত্রণ করে। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সামাজিক অবস্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলার ক্ষমতা সবকিছুই নির্ধারণ করে তার প্রসব কোথায় হবে- বাসায় না হাসপাতালে।

এই গবেষণাটি থেকে তিনটি বিষয় পরিস্ফুটিত হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে ধারণা, সমাজের স্বাস্থ্য অঙ্গনে দাইয়ের কোনঠাসা অবস্থান এবং সুসংগঠিতভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা।

সুস্বাস্থ্যের মাতৃসেবা কেন্দ্রকে মহিলাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশমালার উপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। যেমন,

- সুস্বাস্থ্যকে পুর্ণাঙ্গভাবে মাতৃস্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ করে সিজারিয়ান বিভাগ, রক্ত পরিসঞ্চালন ও ল্যাবরেটরী সেবা;
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জেন্ডার সংবেদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- দেশীয় প্রসব সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করা;
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- গ্রামের মহিলাদের গর্ভকালীন সমস্যা, মাতৃসেবায় নারীর অধিকার, ও স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- খরচ যথাসম্ভব কম করা;
- এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা;
- দাই ট্রেনিং নতুন আঙ্গিকে করা;

- দাইদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

গবেষণার অভিজ্ঞতা সুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই গবেষণা থেকে মহিলাদের প্রসবকালীন চাহিদা ও প্রত্যাশা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এই চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী মাতৃসেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক অঙ্গীকার।

ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর একটি সমীক্ষা*

লামিয়া শারমীন ও হেলগা রেইনার

ঢাকা একটি জনবহুল নগরী বর্তমানে যার জনসংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ ভাগ দরিদ্র বস্তিবাসী যারা বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা হতে বঞ্চিত। বর্তমান সমীক্ষাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা শহরের বস্তিসমূহে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের বর্তমান চিত্র তুলে ধরা এবং বস্তিতে বিভিন্ন এনজিও-র বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা প্রদানে কী ধরনের কার্যক্রম চালাচ্ছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা।

সেফটি ট্যাঙ্ক ও বায়োগ্যাস প্যান্ট সহ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে বস্তিতে পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্যান ইন্টারন্যাশনাল বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জনগণ এই পয়ঃনিষ্কাশন এবং নলকূপের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে দশ ভাগ ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করে।

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) বেশ কিছু গণ শৌচাগার নির্মাণের মাধ্যমে বস্তিতে শৌচাগারের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালিয়েছে। ডিএসকে যে সমস্ত নতুন শৌচাগার স্থাপন করেছে তা বস্তিবাসীর মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে নকশা প্রণয়ন করে তৈরী করা হয়েছে। বস্তিতে পানির সমস্যা সমাধানেও দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বেশ কিছু নতুন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন, তারা বস্তিবাসী পরিচালিত জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকার বেশ কিছু বস্তিতে পানির সমস্যা মিটিয়ে চলছে। জলাধারে ওয়াসার পাইপ থেকে পানি এসে জমা হয় এবং জলাধারের পানি উত্তোলনের জন্য একটি টিউবওয়েল থাকে যার মাধ্যমে জলাধারে জমাকৃত পানি উত্তোলন করা যায়। এছাড়া

---

*'Providing the urban poor with water and sanitation: an introduction' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (আগষ্ট ১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন লামিয়া শারমীন

ওয়াসার পাইপের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি কল থাকে যার মাধ্যমে ওয়াসার পাইপে পানি থাকলে তা সরাসরি ব্যবহার করা যায়। ফলে মোটামুটি ২৪ ঘন্টাই বস্তিবাসীর পানির চাহিদা পূরণে এই জলাধার সক্ষম। স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বস্তিবাসী কাপড় কাঁচা, গোসল করা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজে এই পানি ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানের ডিএসকে এর জলাধার কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫ হাজার বস্তিবাসী উপকৃত হচ্ছে। বস্তিবাসীর মধ্যে যারা জলাধার পরিচালনার ভার নিতে ইচ্ছুক ডিএসকে তাদেরকে নিয়ে একটি দল গঠন করে। তারপর এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বস্তিবাসীর মধ্য হতে গঠিত দলকে জলাধার নির্মাণ বাবদ ৬০,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয় যা ২৪টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ডিএসকে জলাধার স্থাপনের ব্যাপারে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা ওয়াসা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে কাজ করে।

প্রশিকা ১৯৭৬ সন হতে বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। প্রশিকা তার সদস্যদের রিং-স্ল্যাব পায়খানার জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু বস্তিতে তারা গণ শৌচাগারও নির্মাণ করেছে।

কনসার্নও বস্তিতে পানি ও শৌচাগারের সুবিধা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে। তারা বস্তিবাসীদের মধ্য হতে ৫ জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে যারা গণ শৌচাগারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। তবে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শৌচাগার সমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হয় শৌচাগারসমূহ জনগোষ্ঠীর তুলনায় অপ্রতুল অথবা রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না।

বিভিন্ন নলকূপ এবং শৌচাগার সমূহের প্রযুক্তিগত কার্যকারিতাও এই নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, বায়োগ্যাস উৎপাদনে সক্ষম এমন শৌচাগার এর সুবিধা-অসুবিধা অথবা জলাধার এবং নলকূপ এর সুবিধা-অসুবিধা সমূহ ইত্যাদি। বায়োগ্যাস উৎপাদনে সক্ষম এমন শৌচাগারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বায়োগ্যাস রান্নার জন্য জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং এই শৌচাগারের যে স্থানটিতে বর্জ্য জমা হয় তা দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পরিষ্কার করলেও চলে। উপরোলিখিত সুবিধার পাশাপাশি কিছু কিছু অসুবিধাও এই শৌচাগারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এর নির্মাণে অনেক জায়গার যেমন প্রয়োজন তেমনি আশেপাশে পানির উৎস থাকাও জরুরী।

অন্যদিকে পানি সরবরাহের জন্য নির্মিত নলকূপ এবং জলাধার এর প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা বিচারে দেখা যায়, এ দু'টি উৎসেরই প্রচুর সুবিধা রয়েছে তবে সাথে সাথে বেশ কিছু অসুবিধাও বিরাজমান। যেমন, ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশঃই নীচে নেমে যাবার কারণে কতখানি গভীরতায় নলকূপ স্থাপন করলে ভবিষ্যতেও পানি পাওয়া যাবে তা একটি বিবেচনার বিষয়। অন্যদিকে জলাধার এর সংযোগ যেহেতু ওয়াসা লাইনের সাথে ফলে দেখা গেছে ওয়াসা লাইনের পানির অপ্রতুলতার কারণে বেশ কিছু জলাধার ভাল কাজ করছে না।

এই নিরীক্ষার মাধ্যমে এলাকার জনগণ গণ শৌচাগার এবং জলাধার কতটুকু সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে পরিচালনা করছে তাও দেখা হয়েছে। যেমন, বায়োগ্যাস উৎপাদনে সক্ষম এমন পায়খানার ক্ষেত্রে এলাকার জনগণ মোটামুটি এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব নিয়ে সফল। তবে জলাধার সম্পূর্ণভাবে এলাকাবাসী থেকে নির্বাচিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত। এই সমীক্ষায় এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জলাধার সমহ সুন্দরভাবে পরিচালিত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ ব্যর্থ হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট যে, প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান এবং অর্থের অভাবে এলাকাবাসী পুরোপুরি কোন বায়োগ্যাস পায়খানা এবং জলাধারের দায়িত্বভার সঠিকভাবে নিতে পারছে না।

উক্ত সমীক্ষায় যে সমস্ত প্রকল্পের কথা উলেখ করা হয়েছে তার কোনটিই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে যে সমস্ত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার মধ্যে বায়োগ্যাস পায়খানাকেই শহরস্থ বস্তিবাসীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। কারণ, এই পায়খানায় বর্জ্য কম তৈরী হয় এবং তা বিকল্প জ্বালানীরও সংস্থান করে।

যেহেতু গভীর নলকূপ স্থাপন যথেষ্ট ব্যয়বহুল তাই পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা ওয়াসা লাইনের সাথে সংযুক্তি। তাই শহরের বস্তিবাসীদের বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন তথা উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়ার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন এনজিও যারা শহরের বস্তিবাসীদের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করছে তাদের মধ্যে সমন্বয়। তাছাড়া বস্তিবাসিদের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার পাশাপাশি সাধারণ স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়াও জরুরী।

মির্জাপুর উপজেলায় এইডস সচেতনতা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা*

শামীম আরা বেগম ও ফজলুল করিম

বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এইডস একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক। জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ১২ লক্ষ শিশু এবং ৩২ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক এইডস-এ আক্রান্ত হয়েছে।

এইডস প্রতিরোধের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সবাইকে এই ভয়াবহ রোগ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্র্যাকের গবেষণা ও মল্যায়ন বিভাগ আইসিডিডিআর,বি-র সহযোগিতায় ১৯৯৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মতলব উপজেলায় একটি পরীক্ষামলক কর্মসচি হাতে নেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে এই বিভাগ ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসচির সহযোগিতায় মির্জাপুর উপজেলার তিনটি এলাকায় এই কার্যক্রম বর্ধিত করে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামের সমস্ত দম্পতি ও কিছু কিছু কিশোর-কিশোরী যারা কোন ক্লাবের সদস্য/সদস্যা তাদের এইডস সম্পর্কে সচেতনতার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়।

১৯৯৯ সালের জুন-জুলাই মাসে মির্জাপুর উপজেলার তিনটি এলাকা থেকে এই গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যাদের এইডস সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাদের এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই পরীক্ষামলক কর্মসচির মাধ্যমে এইডস সম্পর্কে মানুষ কতটুকু সচেতন হয়েছে তা মল্যায়ন করাই ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। জরিপ ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপের জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে আটশত দম্পতি, আটশত কিশোর-কিশোরী (যারা সচেতনতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত) এবং কার্যক্রম বহির্ভূত আটশত সহ মোট দুই হাজার চারশত উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়।

---

*'Evaluation on AIDS awareness pilot project in Mirzapur upazila' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন শামীম আরা বেগম।

তিনটি এলাকায় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ উপরোলিখিত প্রত্যেকটি দলের সাথে তিনটি করে মোট ২১টি দলীয় আলোচনা করা হয়। ফলাফল বিশেষণের সুবিধার জন্য উত্তরদাতাদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন, খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি ও খারাপ।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় বেশিরভাগ উত্তরদাতাই এইডস সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন আছেন। এইডস এর প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ‘খুব ভাল’ উত্তর দিয়েছে ৪%, ভাল উত্তর দিয়েছে ৪০% এবং মোটামুটি কিছু বলেছে ২৯% জনগোষ্ঠী। তুলনামলক বিশেষণে দেখা গেছে ব্র্যাক সদস্যদের এইডস সম্পর্কিত জ্ঞান বেশি। যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল তারা বেশি সচেতন। যেসব কিশোর-কিশোরী এই কার্যক্রমের আওতাধীন ছিল তাদের সাথে কার্যক্রম বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীদের তুলনা করে দেখা গেছে কার্যক্রমের আওতাধীন কিশোর-কিশোরীরাই বেশি সচেতন। এইডস কী, এটা হলে কী হয় এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে ৩৭% উত্তরদাতা বলেছে এইডস একটি মারাত্মক রোগ, ৪৪% বলেছে এইডস হলে মৃত্যু হয় এবং ১৮% বলেছে এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

কিভাবে এইডস ছড়ায়-এ প্রশ্নের জবাবে ৫০% উত্তরদাতা বলেছে এইডস রোগীর সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে, ৪২% বলেছে এইডস রোগীর ব্যবহৃত সুচ, সিরিঞ্জ, ক্ষুর, কাঁচি, বেড ইত্যাদি অন্যজন ব্যবহার করলে এবং ১৭% বলেছে এইডস রোগীর রক্তগ্রহণ করলে।

এ রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়-এ প্রশ্নের জবাবে ৪০% বলেছে যৌন মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করলে, ২০% বলেছে অবৈধ যৌনমিলন থেকে বিরত থাকলে এবং ১৮% বলেছে আলাদা বা জীবাণুমুক্ত সুচ, সিরিঞ্জ, ক্ষুর, কাঁচি, বেড ইত্যাদি ব্যবহার করলে।

গ্রামের দম্পতিদের চেয়ে কিশোর-কিশোরীদের এইডস সম্পর্কিত জ্ঞান বেশি। এখানে একটি উলেখযোগ্য বিষয় হলো এ রোগ সম্পর্কে যেসব কিশোর-কিশোরী কোন শিক্ষা পায়নি তাদেরও গ্রামের দম্পতিদের চেয়ে জ্ঞান বেশি। অনুমান করা হয়, যে সব কিশোর-কিশোরী এইডস সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছে তারা তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সাথে এর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করে। ফলে তারা এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল তারা এইডস সম্পর্কে বেশি সচেতন। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে ধনী লোক বেশি শিক্ষিত। পাশাপাশি গরীবদের মধ্যে শিক্ষার হার কম, ফলে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী লিখিত

লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়তে না পারার ফলে এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানতে পারে না। তবে যারা ব্র্যাকের সদস্য নয় তাদের তুলনায় সদস্যদের এ সম্পর্কীয় জ্ঞান বেশি। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে ব্র্যাক সদস্যরা গুরুত্ব সহকারে এইডস সম্পর্কিত তথ্য শোনে বা ব্র্যাক কর্মীরা সাধারণতঃ সদস্যদের কাছেই এ সম্পর্কিত তথ্য পৌঁছায়।

তাছাড়া ৬৮% কিশোর বলেছে এইডস রোগীর সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। সুতরাং কিশোর বয়সে এইডস সম্পর্কে এই জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা এইডস কার্যক্রমের জন্য খুব ভাল ফল। এই কার্যক্রমের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো জনগণকে কনডম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু ফলাফলে দেখা গেছে যে মাত্র ৪০% উত্তরদাতা এইডস প্রতিরোধের উপায় হিসাবে কনডম ব্যবহারের কথা বলেছেন। সর্বোপরি দেখা যায় যে, কম সময়ের প্রচারে জনগণ কেবল এইডস সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে আরো ব্যাপক প্রচার চালালে জনগণ এ ব্যাপারে কার্যকর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্বাস্থ্য সেবিকারা কী শ্বাসতন্ত্র সংক্রমণ নির্ণয় করতে পারেন?*

আবদুলাহেল হাদী

অনুন্নত দেশের শিশু মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হলো শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ। এই রোগটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আশির দশকের মাঝামাঝি একটি উপায় উদ্ভাবন করে। সংস্থার মতে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবীদের মাধ্যমে এই রোগটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং নিরাময় করা সম্ভব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ দেশই এই জাতীয় উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়। সময় মতো এবং সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে না পারার সমস্যা বেশিরভাগ দরিদ্র দেশে রয়েই যায়।

বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০০ শিশু মারা যায় শ্বাসতন্ত্র সংক্রমণে। সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাকও ১৯৯২ সালে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের উদ্যোগ নেয়। শুরু থেকেই ব্র্যাক একটি সাশ্রয়ী, লাগসই ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের এই ব্যাপক কর্মসূচির পুরোভাগে রয়েছে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকারা। খণ্ডকালীন এই স্বাস্থ্যসেবিকারা সকলেই মহিলা, স্বল্প শিক্ষিত, স্থানীয় এবং দরিদ্র। স্বল্প শিক্ষিত হলেও ব্র্যাক এই মহিলাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং তাদের কাজের নিয়মিত তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করে।

নির্বাচিত স্বাস্থ্যসেবিকাদের তিনদিনব্যাপী দিনভর মৌলিক প্রশিক্ষণ ছিল বাধ্যতামূলক। শিশু চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে এই তিনদিনের শিক্ষাক্রমে শ্বাসতন্ত্র সংক্রমণ রোগ নির্ণয়ের কৌশল, রোগ নির্ণয় এবং প্রতিকারের উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা এবং হাতে-কলমে পরীক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবিকাদের প্রতিমাসে একবার দিনভর রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে হতো। মাসে একবার এই রিফ্রেশার্সের সুযোগে সেবিকারা তাদের ঘাটতিটুকু পূরণ এবং দক্ষতাকে ঝালাই করে নিতে পারতেন।

---

*শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ সংক্রান্ত তিনটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)।

এছাড়াও প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার স্বাস্থ্য কর্মসূচির তত্ত্বাবধায়কগণ মাঠ পর্যায়ে সেবিকাদের কাজকর্ম সরেজমিনে দেখতে যেতেন। এ পরিদর্শনের সময়েও সেবিকারা তাদের রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তত্ত্বাবধায়কদের সাথে আলোচনার সুযোগ পেতেন এবং নিজের ঘাটতিটুকু পূরণ করে নিতে পারতেন।

স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগ নির্ণয় দক্ষতা নিরূপণের জন্য ময়মনসিংহ, বগুড়া ও দিনাজপুরের দশটি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে এই গবেষণা চালানো হয়। পাঁচজন অভিজ্ঞ শিশু চিকিৎসক ১২০ জন সেবিকার কর্ম দক্ষতা নিরূপণের জন্য সরাসরি মাঠপর্যায়ে অসুস্থ শিশু শনাক্তকরণ ও রোগ নির্ণয় পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর ঐ চিকিৎসকগণ নিজেরাই আবার একই শিশু পুনরায় পরীক্ষা করলেন সঠিক রোগটি শনাক্ত করার জন্য। চিকিৎসকদের রোগ নিরূপণের তালিকার সাথে সেবিকাদের রোগ নির্ণয়ের তুলনা করেই সেবিকাদের কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়।

সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য সেবিকাদের রোগ নির্ণয় দক্ষতা ছিল ইতিবাচক। সর্বমোট ১,১৬৬ জন পরীক্ষিত শিশুর মাঝে ডাক্তারগণ মোট ২৬৩ জন শিশুর শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ আছে বলে নিশ্চিত হলেন। এই ২৬৩ জন সংক্রমিত শিশুর মাত্র ১৭৮ জনকে সেবিকারা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারলেন। সেবিকাদের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা হিসেব করলে দাঁড়ায় মাত্র ৬৮%। আবার চিকিৎসকগণ যেখানে ৯০৩ জন শিশুর কোন সংক্রমণ নেই বলে নিশ্চিত সেখানে সেবিকাগণ সঠিকভাবে ৮৬০ জন শিশুকে চিহ্নিত করতে পারলেন যে তাদের কোন সংক্রমণ নেই। এই ক্ষেত্রে সেবিকার রোগ নিরূপণ দক্ষতার হার দাঁড়ালো প্রায় ৯৫%। দুটি বিষয় একত্রে হিসাব করলে সেবিকার দক্ষতার পরিমাপ দাঁড়াবে প্রায় ৮১%। মনে রাখা দরকার যে 'মারাত্মক' এবং 'খুবই মারাত্মক' সংক্রমণ নিরূপণের ক্ষেত্রে সেবিকাদের দক্ষতা অত্যন্ত কম। এর কারণ হচ্ছে যে সমস্ত লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করতে হয় তার অনেকগুলো লক্ষণই সেবিকারা শনাক্ত ও অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। শিশুর বুকের পাজরের উঠা-নামা, নিশ্বাসের শব্দ কিংবা দ্রুত নিশ্বাস নেয়া যত সহজে ও সঠিকভাবে বোঝা যায় - খিঁচুনী কিংবা শিশুর শরীরের সঠিক তাপমাত্রা নিরূপণ তত সহজে করা যায় না।

সেবিকাদের এই দুর্বল দিকগুলোর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, প্রায় ৪৩ শতাংশ সেবিকা মূল প্রশিক্ষণে অংশ নেয়নি। বস্তুতপক্ষে এদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই করা যায়নি। মাসে একদিনের রিফ্রেশার্স কর্মসূচি থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং বাস্তব বুদ্ধি দিয়েই তারা শ্বাসতন্ত্র সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ করে যাচ্ছে।

আবার মাঠ পর্যায়ে সব সেবিকার কাজকর্মই যে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে তাও নয়।

গবেষণায় ২৮% সেবিকা তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়নি। মৌলিক প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা ও নিয়মিত তত্ত্বাবধানের অভাবে স্বাস্থ্য সেবিকাদের রোগ নির্ণয়ন দক্ষতা ও সেবার মান অনেকাংশেই ব্যাহত হচ্ছে।

গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্র মেয়েদের সমন্বয়ে গঠিত স্বাস্থ্য সেবিকাদের সাহায্যে শ্বাস রোগের সংক্রমণসহ শিশুদের বিভিন্ন রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা সম্ভব। ব্র্যাকের এই সংক্রমণ প্রতিরোধ কর্মসচি আরো কার্যকরী ও সফল হতে পারতো যদি সব সেবিকাদের যথাযত প্রশিক্ষণ এবং মাঠপর্যায়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা যেতো।

গর্ভাবস্থায় আয়রন বড়ি সেবনের প্রভাব সম্পর্কিত একটি গবেষণা: মাঠকর্মীদের অভিজ্ঞতা*

মো. মিজানুর রহমান, এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, চৌধুরী এস বি জালাল

মহিলাদের স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারটি আমাদের দেশে সবসময়ই অবহেলিত হয়ে আসছে। তাই ব্র্যাক ১৯৯৭-৯৮ সালে ময়মনসিংহের দাপুনিয়া ও শম্ভুগঞ্জ এলাকায় গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতা ও আয়রণ বড়ি সরবরাহ কার্যক্রমের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে।

গবেষণা চলাকালীন সময়ে গর্ভবতী মহিলাদের নিকট থেকে মোট ৫ বার রক্ত, ৩ বার পায়খানা, প্রসব পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে শিশুর জন্ম ওজন এবং গবেষণা সংশিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রকল্প থেকে তাদেরকে শুধুমাত্র আয়রণ বড়ি ছাড়া অন্য কিছুই দেওয়া হয়নি। এখানে অনেক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ হয় যেগুলির ব্যবহার বাংলাদেশে এই প্রথম, এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে।

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ এমনিতেই সুঁচ ফুটানোর ভয়ে ইনজেক্শন নিতে চায় না, তার উপর শিরা থেকে প্রতিবার ৩ সি.সি. করে ৩ বার এবং আঙ্গুল থেকে ২ বার রক্ত দিবে এমন চিন্তা করতেই অনেকে সংশয় করেন। নতুন যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ব্যাপারেও নানান সমস্যা হয়। এই প্রকল্পে ব্যবহৃত মেডিকেশন ইভেন্টস মনিটরিং সিস্টেম [Medication Events Monitoring System (MEMS)] হল কৌটার ঢাকনার আকৃতির একটি মল্যবান যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্রটি মহিলাদেরকে প্রদত্ত আয়রণ বড়ির কৌটায় লাগানো হয়। এই ঢাকনার বৈশিষ্ট হলো মহিলারা কখন বড়ি খায় তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে

---

*'Research on iron supplementation during pregnancy: a document of field experience' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (অক্টোবর ১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. মিজানুর রহমান।

লিপিবদ্ধ হওয়া। পরে কম্পিউটারের মাধ্যমে মহিলাদের বড়ি খাওয়ার তথ্য সহজেই জানা যায়। এই প্রকল্পে হেমোকিউ ফটোমিটার (Hemocue Photometer) নামে আরো একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যার সাহায্যে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে হিমোগোবিনের মাত্রা নির্ণয় করা যায়। মাঠ পর্যায়ের কোন গবেষণায় এ ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার বাংলাদেশে এই প্রথম।

রক্ত সংগ্রহ করতে যেয়ে মাঠকর্মীদের অনেক কৌশল অবলম্বন করতে এবং অনেক প্রতিকুল ও বিপজ্জনক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেমন, রক্তের পরিমাণ দেখে সংশিষ্ট মহিলা ও তার পরিবারের লোকজন ভীত হয়ে পড়ে এবং তারা গবেষণার জন্য পুনরায় রক্ত দিতে অস্বীকার করে। কোথাওবা গবেষণা কর্মীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে আটকে রেখে নির্যাতন করার পর্যায় পর্যন্ত গড়িয়েছে।

প্রকল্পটি ছিল যথেষ্ট ব্যয়বহুল, কিন্তু সঠিক তত্ত্বাবধানের ফলে সীমিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। তবে এই প্রকল্পে নিযুক্ত মাঠকর্মীগণ তাদের যথেষ্ট বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আত্মসন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে ঠিক তখনই, যখন ঐ এলাকার লোকজন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কর্মীদের সাথে তাদের আচরণগত ত্রুটির কথা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে।

গবেষণা প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে যেমন, কাজ শুরুর আগেই কর্মীদের কাজের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া, ফলে কেউ কোন সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্য সকলেই তৎপর ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলাদের সাথে যোগাযোগ করে এই কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিয়ে রক্ত প্রদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়সলভ আচরণের মাধ্যমে এই গবেষণার কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

কখনো কখনো মহিলার পরিবারের লোকজন রাজী হলেও প্রতিবেশীরা গবেষণার ব্যাপারে নানান কথা বলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে দেখা গেছে। ফলে কাজে বেশ অসুবিধা হতো। তাই মহিলার প্রতিবেশীদেরকেও এ কাজের ব্যাপারে অবগত করা হয়। বিশেষ করে এলাকার মসজিদের ইমাম, স্কুল শিক্ষক, মাতব্বর, কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কাজের ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয়। ফলে তারা আমাদের কাজের বিরোধিতা না করে বরং

সহযোগিতা করতো। গবেষণা প্রকল্প এলাকায় ব্র্যাকের বিডিপি, বিইপি, এইচএনপিপি কার্যক্রম চলমান থাকায় গবেষণা কর্মীগণ এসকল কর্মসচির ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে যোগাগোগ রক্ষা করে চলতো। ফলে সমস্যা সমাধানে তারাও ভূমিকা পালন করে।

দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ এলাকায় ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। তাই এলাকার সাধারণ মানুষের একটা বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, ব্র্যাক তাদের কোন ক্ষতি করবে না। এই বিশ্বাসটা প্রকল্প পরিচালনায় খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রকল্পে কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত কর্মীদেরকে নির্দেশ আকারে না দিয়ে বিষয়টি কর্মীদের সাথে আলোচনা করে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন। কর্তৃপক্ষ মাঠকর্মীদের অনেক প্রস্তাব, পরামর্শ গ্রহণ করে সেটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতেন। ফলে মাঠকর্মীরা অধিক উৎসাহের সাথে তাদের মতামত ব্যক্ত করতেন। এই প্রকল্পের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়নের পদ্ধতিটিও ছিল ব্যতিক্রমী। গবেষকগণ প্রয়োজনীয় তথ্যের বিষয়ে মাঠকর্মীদের সাথে আলোচনা করে তাদের সহায়তায় প্রশ্নমালা প্রণয়ন করেন। ফলে নিজেদের তৈরী প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ অধিক সুবিধাজনক হয়েছে এবং উত্তর দাতাদের জন্যও প্রশ্নপত্রের ভাষা বোঝা সহজতর হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম চলাকালীন প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাঠকর্মীগণ ফিল্ড সুপারভাইজারের নেতৃত্বে বসে ঐ দিনের মাঠকার্যক্রমের উপর আলোচনা করতেন এবং পরবর্তী দিনের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতেন। মল গবেষকগণও সপ্তাহে কমপক্ষে একবার মাঠকর্মীদের সাথে আলোচনায় বসে সপ্তাহের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতেন। অবশেষে এভাবে সফলভাবে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়।

গ্রামাঞ্চলে গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপকতা*

এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার

রক্তস্বল্পতা সারা বিশ্বে একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ধারণা করা হয় পৃথিবীতে মোট ২.২ বিলিয়ন লোক রক্তস্বল্পতার শিকার। উন্নয়নশীল দেশসমূহে গর্ভবতীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। উন্নত দেশে গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতা ১১% হলেও উন্নয়নশীল দেশে তা ৫৯%।

গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন কারণে রক্তস্বল্পতা হলেও লৌহ ঘাটতি জনিত কারণকেই মুখ্য কারণ বলে ধরা হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে রক্তস্বল্পতার জন্যই কম ওজনের শিশু জন্ম হওয়া, অকাল প্রসব ও প্রসবজনিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ হিসাবে গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতাকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতার মারাত্মক অবস্থার কথা সবারই জানা। ভারতে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সেখানে গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতার হার ৫১-৮৮%। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত তথ্য সীমিত হলেও ১৯৯৫-৯৬ সালে সম্পাদিত জাতীয় পুষ্টি জরিপে দেখা গেছে আমাদের দেশে গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতা ৬০%। আবার এলাকা ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে দেখা গেছে গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতা ৪২-৬০% এর মধ্যে।

পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় অত্যন্ত কম হওয়ায় প্রায় ৫৫% এর বেশি জনগণ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। ফলে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১১২ জন এবং মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখে ৮৫০ জন।

---

* 'Prevalence and associated factors of anaemia among pregnant women in a rural area of Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. মিজানুর রহমান।

উলেখিত বিষয়সমহ বিবেচনা করে ব্র্যাক গর্ভবতী পরিচর্যা কেন্দ্রের মাধ্যমে আয়রণ বড়ি বিতরণ শুর করে। গ্রামভিত্তিক এসকল পরিচর্যা কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১৫০টি করে পরিবার অন্র্ভুক্ত থাকে। একজন গ্রাম্য স্বাস্থ্য সেবিকার মাধ্যমে এসকল কেন্দ্র পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের গর্ভবতী মায়েদের রক্তস্বল্পতার ব্যাপকতা দেখার জন্য ১৯৯৭ সালের মে-নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহের সদর উপজেলায় এ গবেষণা পরিচালিত হয়। ব্যাপক অধ্যুষিত সমতল এই এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা দেশের অন্যান্য এলাকার মতই সীমিত।

এ গবেষণায় ব্র্যাকের ৫০টি গর্ভবতী পরিচর্যা কেন্দ্রের আওতাভুক্ত সকল গর্ভবতীদের (৬১১) শনাক্ত করা হয়। এদের মধ্যে যাদের গর্ভের বয়স ২৪ সপ্তাহের কম এবং বর্তমান গর্ভাবস্থায় আয়রণ বড়ি খায়নি তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা হয়। পরে তাদেরকে গর্ভবতী পরিচর্যা কেন্দ্রে এসে শারীরিক পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। যাদের গর্ভের বয়স ২৪ সপ্তাহের কম, জরায়ুর উ ্চতা ২২ সে.মি. এর কম এবং বর্তমান গর্ভাবস্থায় আয়রণ বড়ি খায়নি প্রতি গর্ভবতী পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে এমন ৪ জন করে মোট ২০০ জন মহিলা গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া যারা প্রথমবার শিরা থেকে রক্ত নেয়ার পর গবেষণার অন্র্ভুক্ত থাকতে অস্বীকার করেছিল এমন ১৬ জন সহ সর্বমোট ২১৬ জন মহিলাকে গবেষণার অন্র্ভুক্ত করা হয়। খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রজনন ইতিহাস, সর্বশেষ মাসিকের তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

গর্ভবতী পরিচর্যা কেন্দ্রে মায়েদের জরায়ুর উ ্চতা, উপরিবাহুর মধ্যভাগের পরিধি এবং হিমোগোবিনের মাত্রা নিরূপণ করা হয়। হিমোগোবিন নির্ণয়ের জন্য সহজে বহনযোগ্য হেমোকিউফটোমিটার ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কৃমি আছে কিনা জানার জন্য পায়খানার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ও অংশগ্রহণ করেনি এমন মহিলাদের তুলনা করে দেখা হয়। গবেষণায় অন্র্ভুক্তকরণের সময় অংশগ্রহণকারী ও তুলনাকারীদের মধ্যে বয়স ও গর্ভের বয়সের তেমন কোন পার্থক্য ছিলনা। অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সন্ান ধারনের সংখ্যা তুলনাকারীদের চেয়ে কম ছিল। তুলনাকারী মহিলাদের চেয়ে অংশগ্রহণকারীগণ বেশি সংখ্যক কৃষি কাজে নিয়োজিত ছিল। অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু সংখ্যক মহিলার নির্দিষ্ট স্থানে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল। উভয় গ্র পের মহিলাদের বসতবাড়ীর মালিকানা, শিক্ষা, খানার বা মহিলার ব্যক্তিগত সম্1দ এবং বাসগৃহের নির্মাণ সামগ্রীর

ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। অংশগ্রহণকারী মহিলাদের রক্তস্বল্পতা ৫৬%, গড় হিমোগোবিনের মাত্রা ১০৯.৫+১৪.৫ গ্রা./লি. এবং মধ্যম ও স্বল্পমাত্রার রক্তস্বল্পতা যথাক্রমে ২৭.৭% এবং ৩২.৯%। গবেষণাভুক্তদের মধ্যে কোন গুরুতর রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত মহিলা পাওয়া যায়নি।

রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত এবং আক্রান্ত নয় এমন মহিলাদের বয়সের গড় যথাক্রমে ২৫ ও ২৪ বৎসর। ৩৫ বা তদুর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের মধ্যে এই হার খুবই বেশি। রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২৪ বছরের কম বয়সীদের তুলনায় ৩৫ উর্ধ্ব বয়সী মহিলাদের ২.২ গুণ বেশি।

রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত মহিলাদের সন্তান সংখ্যা গড়ে ২ জন এবং যারা আক্রান্ত নয় তাদের ১.৮ জন। সন্তান ধারনের সংখ্যার সাথে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে কোন যোগসত্র দেখা যায়নি। তবে ৫ বা তার অধিক সন্তানের মায়েদের রক্তস্বল্পতার হার ৭০%।

গবেষণায় দেখা গেছে খানা প্রধানের পেশা ও চাষযোগ্য জমি রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তুলনামলকভাবে যাদের ৫০ শতাংশের কম জমি আছে তাদের মধ্যে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। বসতবাড়ী, খানার সম্পদ ইত্যাদি রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন ভূমিকা পালন করেনা।

রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়া ও পুষ্টিগত অবস্থার উপর কৃষিকাজ একটি প্রভাবক হিসাবে কাজ করছে। পুষ্টিগত অবস্থার সাথে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার একটি যোগসত্র লক্ষ্য করা গেছে। ৭৩% পুষ্টির অভাবজনিত এবং ৫৮% পুষ্টিসমৃদ্ধ গর্ভবতী মা রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হয়। অকৃষি নির্ভর খানাগুলিতে পুষ্টিগত অবস্থার সাথে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ায় খুব একটা পার্থক্য দেখা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ ৫২% পুষ্টির অভাবজনিত মা এবং ৪৫% পুষ্টি সমৃদ্ধ মা রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্পের গ্রাম ভিত্তিক পুষ্টি কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সচকের মল্যায়ন*

আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, সাদিয়া এ চৌধুরী, চৌধুরী এস বি জালাল ও হার ন কে এম ইউসুফ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সেই দেশের জনগণের পুষ্টিগত অবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিস্থিতি জানার জন্য এটি একটি গুর ত্বপর্ণ সচক। পুষ্টি সমস্যা ও তার কারণ চিহ্নিতকরণ, গুর তর পুষ্টি সমস্যার ব্যাপারে পর্বাভাস দেয়া ও সমস্যা দর করার জন্য সংশিষ্ট বাস্বায়নাধীন কর্মসচির তথ্য প্রয়োজন। বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প প্রায় তিন বছর যাবৎ ছয়টি উপজেলায় পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৯৮ সালে এই কার্যক্রম ৩৪টি উপজেলায় বিস্তৃত করা হয়।

প্রকল্পের পরীক্ষামলক কর্মসচিতে কিছু সচক ব্যবহৃত হয়েছে। একটি স্বাধীন মল্যায়নের মাধ্যমে এ সকল সচকের গুণাগুণ ও কার্যকারিতা নিরূপণ করা প্রয়োজন। নিয়মিত কার্যক্রমের তথ্যাদি জানার জন্য যদি আরও সহজ, কার্যকরী ও গুণগত মানসম্পন্ন সচক উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা যায় তবে প্রকল্পের মল্যায়ন ব্যবস্থা উপকৃত হবে। গ্রাম্য পুষ্টি কর্মী [(Community Nutrition Promoter (CNP)] কর্তৃক ব্যবহৃত সচকগুলো যাচাই করে দেখা এই প্রকল্পের মল লক্ষ্য।

গবেষণা প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো:

- বর্তমান ব্যবহৃত সচকগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করা।
- সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্পের গ্রামভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের কর্মীদের ব্যবহৃত সচকসমহ কতটুকু স্পর্শকাতর ও সুনির্দিষ্ট তা যাচাই করা।

---

*'Evaluation of indicators for monitoring of the project activities under community based nutrition component of Bangladesh integrated nutrition project' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৯)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. মিজানুর রহমান।

- নিয়মিত প্রকল্প অবলোকনের জন্য আরও কিছু সাধারণ, কার্যকরী ও অল্প খরচের নতুন সচক ব্যবহারের সুপারিশ করা।

সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্পের প্রথম ধাপের একটি উপজেলা মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুরকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়। এই উপজেলার ১৬০টি পুষ্টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫২টিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতি পুষ্টি কেন্দ্র থেকে ২ বছরের কমবয়সী ২০ জন শিশু (১০ জন ছেলে ও ১০ জন মেয়ে) ও ১০ জন মাকে (৫ জন দুগ্ধদানকারী ও ৫ জন গর্ভবতী) এই গবেষণাভূক্ত করা হয়। মোট ৫৩২ জন ছেলে ও ৫১৮ জন মেয়ে এবং ২৬০ জন গর্ভবতী ও ২৫৪ জন দুগ্ধদানকারী মা সহ সর্বমোট ১,৫৬৪ জন গবেষণায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

প্রশ্নপত্র পরণ, দৈহিক পরিমাপ, ক্লিনিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট, বায়োক্যামিক্যাল টেষ্ট ছাড়াও এলাকাবাসী, তৃণমল পর্যায়ের প্রকল্পকর্মী এবং সংশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের সংগৃহীত ওজনের সাথে গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীর সংগৃহীত ওজনের মধ্যে তাৎপর্যপর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের ওজনকে সঠিক মানদণ্ড ধরে গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীদের সংগৃহীত ওজনের সাথে তুলনা করে সন্তোষজনক মনে হয়নি। শিশু, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা সকলের ক্ষেত্রে একই অবস্থা দেখা গেছে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীদের নেয়া ওজন প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম। মোট ৬০৯ জন মায়ের ওজন নেয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত ওজনের চেয়ে ৩৬৮ জনের কম এবং ৭৯ জনের বেশি ওজন দেখানো হয়েছে। উলেখিত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীদের নেয়া ওজন সঠিক নয়।

গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীদের নেয়া ওজন ভুল হওয়ার যে সকল কারণসমহ চিহ্নিত করা হয় তা নিম্নরূপ:

- ৫২টি ওজন নেয়ার যন্ত্রের মধ্যে ৫১টি ত্র টিযুক্ত ছিল যা ওজন নেয়ার পর্বে যাচাই করে দেখা হয়নি।
- ওজনদাতা ওজনযন্ত্রের উপর সঠিকভাবে দাঁড়িয়েছে কিনা তা না দেখে তাড়াহুড়ো করে ওজন নেয়া।
- ওজনযন্ত্র সমান জায়গায় স্থাপন না করে ওজন নেয়া।
- মায়েদের দোলনা ধরে থাকা অবস্থায় শিশুদের ওজন নেয়া।

গ্রাম্য পুষ্টি কর্মী কর্তৃক মা ও শিশুর উচ্চতা নেয়া সন্তোষজনক ছিল। পুষ্টি কর্মীরা সাধারণতঃ একটি দেয়ালের বিপরীতে মাকে দাঁড় করিয়ে উচ্চতা পরিমাপ করে থাকে। উচ্চতা মাপার স্কেলের সাহায্যে নেয়া উচ্চতার সাথে প্রচলিত পদ্ধতিতে নেয়া উচ্চতার তেমন পার্থক্য দেখা যায়নি।

মায়েদের বিএমআই [Body Mass Index (BMI)] ১৮.৫ এর কম হলে তাদের খাবার তালিকাভুক্ত করা হয়। যেহেতু মায়েদের ওজন ভুল নেয়া হয় তাই একটি উলেখযোগ্য সংখ্যক মা খাদ্য তালিকাভুক্ত হয়ে যায় যারা প্রকৃত পক্ষে খাদ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীদের হিসাব অনুযায়ী গবেষণা চলাকলীন উক্ত এলাকায় বিএমআই ১৮.৫ এর কম ৬৫% এবং ব্র্যাক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের হিসাব অনুযায়ী ৫৮.৪%। এভাবে ৪০টি উপজেলায় পুষ্টি সহায়তা কর্মসচিতে অনেক অতিরিক্ত মা খাদ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

ভ্রূণের বয়স হিসাব করার জন্য এ গবেষণায় কোন অত্যাধুনিক পদ্ধতি বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। শেষ মাসিকের তারিখের উপর গ্রাম্য পুষ্টি কর্মী কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্ত সন্তোষজনক নয়। ফলে পুষ্টি কর্মীরা শেষ মাসিকের সঠিক তারিখ বের করে সম্ভাব্য সন্তান প্রসবের সময় হিসাব করতে পারেনি।

গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীদের ক্ষেত্রে আরো দেখা যায় যে,

- উপরিবাহুর মধ্যভাগ এবং মাথার পরিধি সঠিকভাবে পরিমাপ করেছে।
- প্রস্রাবের শর্করা পরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিস নির্ণয় সঠিক হয়।
- রক্তস্বল্পতা ও কৃমির লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয় হয়নি।

সব মায়েরাই প্রতিমাসে তাদের নিজেদের ও শিশুদের ওজনসহ অন্যান্য পরিমাপ প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহী ও সহযোগী মনোভাব দেখিয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের শারীরিক পরিমাপের ব্যাপারে তাদের স্বামী, শ্বশুরবাড়ির লোকজন অথবা পরিবারের অন্য কোন সদস্য বাধা দেয়নি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে এটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশ সমহ করা হয়:

- মা ও শিশুদের ওজন নেয়ার ক্ষেত্রে সকল ত্র টিযুক্ত যন্ত্র পাল্টাতে হবে।
- প্রতিবার ওজন নেয়ার কার্যক্রম শুর র আগে যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং গ্রাম্য পুষ্টি কর্মীদের মাসিক রিফ্রেশার্সে এ ব্যাপারে গুর ত্বারোপ করতে হবে।
- মায়েদের উচ্চতা নেয়া চলমান পদ্ধতিতে চলবে।
- শিশুদের উচ্চতা মাপা যদিও গুণগত দিক দিয়ে ভাল তবে এর গ্রহণযোগ্যতা কম। তাই এ ব্যাপারে কোন সুপারিশ করা হয়নি।
- দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী মায়েদের বয়স স্থানীয় ঘটনা আলোচনা করে সতর্কতার সাথে নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হবে।
- বিএমআই এর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ওজন নিতে হবে। যদি গর্ভের বয়স ৬ মাসের বেশি হয় তাহলে মায়েদের ওজনের ভিত্তিতে বিএমআই নির্ণয় করা সঠিক হবে না।
- স্থানীয় ঘটনার কথা উলেখ করে মায়েদেরকে শেষ মাসিকের তারিখ বলতে সহায়তা করতে হবে।
- আয়রণ বড়ি খাওয়ার হিসাবের ক্ষেত্রে কয়টি ট্যাবলেট দেয়া হয়েছিল এবং কয়টি আছে তা হিসাব করে কয়টি খেয়েছে তা বের করতে হবে।
- জন্মের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে শিশুর ওজন নেয়া সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে আরও গ্রহনীয় করে তুলতে হবে।
- রক্তস্বল্পতা, কৃমির লক্ষণ চিহ্নিতকরণ ও শিশুদের মাথার পরিধি পরিমাপের ক্ষেত্রে উপযুক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা বেশি কিন্তু পরিমাপ নেয়ার গুণগত মান তেমন ভাল নয়। তাই এ ব্যাপারে কোন সুপারিশ প্রদান করা হয়নি।
- প্রস্রাবের শর্করা পরিমাপের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নির্ণয়, উপরিবাহুর মধ্যভাগের পরিধি মাপা, কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদির উপযুক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা ভাল। এগুলো সঠিকভাবে সংযোজন ও ব্যবহার করা যেতে পারে।